রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা

মনোরঞ্জন বসু

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীমতী মীরা বসু
৫০ বি, হালদারপাড়া রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

লোকগুরু

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতের বিস্ময়কর পুরুষ। কোন বিশেষণ দিয়ে যেন তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। তিনি অনন্ত, অপার! তিনি সন্ন্যাসী, না গৃহী? সাকারবাদী না নিরাকারবাদী? দ্বৈতবাদী, না অদ্বয়-নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মবাদী? শাক্ত, বৈষ্ণব না শৈব? তন্ত্রোপাসক, ভক্ত, যোগী, না জ্ঞানী? আচারনিষ্ঠ সৎ ব্রাহ্মণ? সহজিয়া, আউলিয়া, বাউল? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, হিন্দু, মুসলমান, না খৃষ্টান? শ্রীরামকৃষ্ণ এ সব এবং এর বাইরে যা-কিছু আছে, তাও। কোন এক গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে ধরে রাখা যায় না। তিনি সমুদ্র। সব নদী যেমন সমুদ্রে এসে একাকার হয়, সব মত ও পথ তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণে এসে মিলিয়ে গেছে। তিনি সকলের কেন্দ্রবিন্দু, শেষ সীমা, চূড়ান্ত। কি বৈচিত্র্যময় তাঁর ধর্মজীবন, যেমন ব্যাপ্তি তেমন গভীরতা। কি অপূর্ব প্রতিভা। কত শিল্প-সৌন্দর্য্যময় তাঁর অনুভূতি। কত ভঙ্গীতে তাঁর প্রকাশ। কতভাবে কত পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আনাগোনা। সব পথই তাঁর পরিচিত। ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই চলেছেন তো চলেছেন। ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরলাভের পথও অনন্ত। আর, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপিপাসাও অনন্ত। তাঁর নিজের ভাষায়—'মিছরীর রুটি সোজাভাবে মুখে দাও, আর আড়ভাবে মুখে দাও, যেভাবেই মুখে দাও, মিষ্টি লাগবে'। ঈশ্বরকে যে-ভাবে ডাকি, যে-নামে ডাকি, ডাকলেই আনন্দ। ডাকা নিয়ে কথা। মন দিয়ে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচার করেন নি, কোন ধর্মমতকে প্রাধান্যও দেন নি। 'যত মত তত পথ' 'যাব যা পেটে সয়'। কেউ তো ঈশ্বরের 'ইতি' করতে পারে না—নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মনো জ্ঞানম। ধর্মের মর্ম যে ঈশ্বরপ্রেম, তাই প্রচার করেছেন, ধর্ম মানে বিবেক-বৈরাগ্য, প্রেম-পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ। মত ও পথ নিয়ে বিতর্ক অবান্তর। যার যে পথ ভাল লাগে, সেই পথ বেছে নিক। চলা নিয়ে কথা। চলতে চলতেই পথ খুঁজে পায় ভক্ত। যেমন পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পথের সন্ধান বলে দিতে তাঁর গুরুর অভাব হয় নি কখনও। যথাসময়ে গুরু উপস্থিত হয়েছেন। চাই আগ্রহ, ব্যাকুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণের মত ব্যাকুলতা। অমনি আটুপাটু করা। ধর্ম মানে শুধু আচার বিচার নয়, ব্রত নিয়ম নয়, আত্মনিগ্রহও নয়—যদিও এদেরও প্রয়োজন আছে অল্পবিস্তর: ধর্ম মানে পাণ্ডিত্যও নয়। পাণ্ডিত্য দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। কিন্তু মুক্তি লাভ করা যায় না—"ভুক্তয়ে, ন তু মুক্তয়ে।" যা জানলে সব জানা হয়, তা জানতে হবে। অর্থাৎ যো-সো করে ঈশ্বর লাভ করতে হবে। পরম প্রাপ্তি, যা পেলে আর কিছু পাবার থাকে না। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য চাই না, চাই ঈশ্বর। পাওয়া বা, জানা মানে হওয়া— "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব

ভবতি।" ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আর সব তুচ্ছ—" যো বৈ ভূমা তত্ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" প্রকৃত সুখ ঈশ্বর লাভে, আর সব সুখ ক্ষণিক, অতএব হেয়। এ বাণী ভারতের শাশ্বত বাণী। এই বাণীর জন্যে, এই সত্যের সাধনার জন্যেই, ভারত, ভারত। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভারতের মূর্ত্ত প্রতীক, আত্মা। পাশ্চাত্ত্য মোহে মুগ্ধ ভারতবাসীকে এই বাণী শোনালেন। শুধু শোনালেন না, দেখালেন—দেখালেন কি ভাবে ঈশ্বর লাভ করতে হয়, আর, করার কি সার্থকতা। ধর্মের উদ্দেশ্য, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা, আর করলে মানুষের কি পরিবর্ত্তন ঘটে, শ্রীরামকৃষ্ণ তার সাক্ষ্য। মানুষ মান্ + হুঁস হয়, হুঁস যুক্ত, চৈতন্যময় হয়। তার স্বার্থান্ধ দূর হয়, সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি খুলে যায়, ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার স্বজন হয়। সস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্বভূতেষু চাত্মানং—নিজের মধ্যে সবাইকে, আর সবার মধ্যে নিজেকে দেখা—এ সেই অবস্থা। এক, দুই নয়। আমি-তুমি ভেদ অজ্ঞান। এক আত্মা, দেহ ভিন্ন। একো দেবঃ সর্বভূতেষু। সকলের দুঃখে আমার দুঃখ, সকলের সুখে আমার সুখ। ভক্তির পথে হোক, আর জ্ঞানের পথে হোক এই একাত্ম দর্শনই মুক্তি, ধর্মের চরম লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বেলায় আগে ফল, তারপর ফুল। আগে অনুভূতি, তারপর দর্শন। তারপর শাস্ত্রের সাথে মেলান। তাঁর সব উক্তিই অনুভূতিসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু বহু পরিশ্রম করে এই বইখানি লিখেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাই বইখানির নাম—'সাধন পরিক্রমা'। এক সার্থক নাম। ভক্ত দেব-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে পরিক্রমা করে, করে আনন্দ পায়, তৃপ্তি লাভ করে ধন্য হয়। এখানে দেব-বিগ্রহ কল্পনার বস্তু নয়, জীবন্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি ঐতিহাসিক সত্য। বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু সন্দিগ্ধ, যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক বিচারনিষ্ঠ অ-ভক্তের দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এক সন্দেহাতীত সত্য। তাঁর সমগ্র সাধন-ইতিহাস কখনই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির গোচর হবে না। কিন্তু সেই রহস্যের আবরণ খানিকটা উন্মোচন করে, তার আংশিক 'পরিক্রমা' করার সুযোগ দিয়ে শ্রীযুক্ত বসু আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

ইতি—

লোকেশ্বরানন্দ

প্রাক্‌কথন

আধ্যাত্মিক রাজ্যে যিনি মহাপুরুষ লোকে সহজেই ধরে নেয় তিনি বুঝি ভগবান স্বয়ং। অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারের দিক থেকে এতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এ-জাতীয় অতিশয়োক্তি সহজেই অলঙ্কারের সীমা অতিক্রম করে যায়; লোকে তখন তাঁকে প্রকৃত ভগবানই মনে করে। যত গোলমাল এইখানে। ভগবানের অসীম গুণরাজি আমাদের নাগালের বাইরে, কাজেই স্বভাবতই সেগুলি অর্জন করবার দুরাগ্রহ থেকে আমরা নিবৃত্ত হই। ভগবান-বোধে মহাপুরুষকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে কিছুটা দূরে পূজার বেদীতে বসাই। মনে করি, তাতেই বুঝি আমাদের কর্তব্য শেষ হল।

পক্ষান্তরে, যদি আমরা তাঁকে আমাদেরই মতো একজন মানুষ, অথচ আমাদের চেয়ে বেশি গুণবান বলে ধরি তাহলে স্বভাবতই ইচ্ছা হবে তাঁর কার্যকলাপ অনুকরণ করি, দৈনন্দিন জীবনে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চলি। সেইজন্যই বোধ হয় ভগবান বারে বারে মানুষ-দেহ গ্রহণ করেন। অথচ, আমরা আমাদের স্বভাবসুলভ আলস্যে প্রতিবারেই মানুষদেহধারী অবতারকে খাঁটি ভগবানের পর্যায়ে ফিরিয়ে দিই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিয়েও আমরা এই খেলা খেলেছি, তাঁকে ভগবান বানিয়ে কৃতকৃত্য বোধ করেছি। এইজন্যই তাঁর মহিমাময় জীবন ও বাণীর প্রভাব বহুলাংশে আমাদের অবচেতন মনেই আবদ্ধ থেকে গেছে. উপরতলে ভেসে আছে কেবল আনুষ্ঠানিক ভজনকীর্তন ও শূন্যগর্ভ ভাববিলাস। বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার রামকৃষ্ণের সাধন পরিক্রমা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই ভ্রান্তি দূরীকরণে, অবচেতন মনের অর্গলমোচনে, সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে 'মানুষ' গদাধর 'সাধক রামকৃষ্ণে' পরিণত হলেন এবং 'সাধক' রামকৃষ্ণের 'সিদ্ধসাধক লোকগুরু' পর্যায়ে 'উত্তরণ' কী ভাবেই বা সম্ভব হয়েছিল। বালক গদাধরের মধ্যে সাধক রামকৃষ্ণের বীজ সুপ্ত ভাবে অবশ্যই ছিল, তা না হলে কামারপুকুরে থাকাকালীন তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা মেলে না। কিন্তু সেই বীজের 'প্ররোহে'র জন্য প্রয়োজন হয়েছিল বিভিন্ন গুরুনির্দেশে 'মানুষ' রামকৃষ্ণের বিভিন্ন পথে আধ্যাত্মিক সাধন-প্রক্রিয়া। প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি ভগবৎ-করুণা লাভ করেছিলেন, এ-কথা ঠিক; কিন্তু তাঁর সব সাধনার মূলে ছিল 'মানুষ'

রামকৃষ্ণের নিজস্ব নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। এ-কথা আরও ঠিক যে, পূর্ণ-সিদ্ধি লাভ একমাত্র ভগবৎ-অনুগ্রহেই, ভগবৎ-সন্নিবেশের ফলেই সম্ভব হয়; কিন্তু ত্রিলোকবাঞ্ছিত সেই সিদ্ধি লাভের পরেও যে তিনি লোকগুরু পদে অধিষ্ঠিত হতে চাইলেন সেটাই প্রমাণ করে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি 'মানুষ'ই থাকতে চেয়েছিলেন—সিদ্ধ 'মানুষ' রূপেই তিনি যাবৎ মানুষের কল্যাণে ব্রতী হতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থকার এই সত্যটি অতি নিপুণ ভাবে দেখিয়েছেন।

সিদ্ধ লোকগুরুর তিনটি অমর বাণী তাঁর অনন্যসাধারণ মানুষ-সত্তা ও অশেষ কল্যাণকর মানবতা-বোধের পরিচায়ক। বাণী তিনটি হল—(১) 'যত মত, তত পথ', (২) 'ভাবমুখে থাক' এবং (৩) 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। তিনটি বাণীরই মূল কথা হল প্রতিটি মানুষে মনুষ্যত্বের মর্যাদা স্বীকার। প্রতি মানুষ-আধারে যে ভগবত্তা তারই নাম (খাঁটি) মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব-বোধই হল যাবৎ মূল্যবোধ ও যাবতীয় কর্তব্যের ভিত্তিভূমি। এরই অপর নাম 'সংস্কারলেশহীন উদারতা'।

এই উদারতার একটা প্রকাশ হল পরম ইষ্টার্থ লাভের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় যে-যে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয় সেই সব কটি পথের প্রতি সমদৃষ্টিচর্চা। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, বিভিন্ন মনুষ্যসমাজে তিনটি পথ স্বীকৃত আছে, যথা—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, এবং প্রতিটি পথে আবার ছোটখাট অনেক উপভেদ আছে। আপন আপন স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী এগুলির যে-কোন একটি বা একাধিক পথ অবলম্বন করে লোকে অগ্রসর হয়। চরম উদ্দেশ্য জীবনে ভগবত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। রামকৃষ্ণের বক্তব্য ছিল, বিভিন্ন ভাবে হলেও, প্রতিটি পথেই আন্তরিকতার সহিত যতই অগ্রসর হওয়া যায় অন্তর্নিহিত ভগবত্তা ততই স্ফুটতা লাভ করে। অতএব, কোন পথই নিন্দনীয় নয়। যে-যার সম্প্রদায়গত বা গুরুনির্দিষ্ট বা নিজবিচারলব্ধ পথে অগ্রসর হবে; কেবল দেখতে হবে পথটি যেন তার স্বভাব ও স্বধর্ম-বিরুদ্ধ না হয়। অনেকের হয়তো-বা অধ্যাত্মপথে আসবার অধিকারই জন্মায় নি, রামকৃষ্ণদেব বলতেন—তারা 'আন্তরিক ভাবে' তাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করে চলুক, তাহলেই কালক্রমে আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাদের আকর্ষণ জন্মাবে। আধ্যাত্মিকতার বড় বড় 'বুলি' শুনিয়ে এদের 'বিচালিত' করা উচিত নয়।

'যত মত, তত পথে'র অর্থ এই নয় যে, প্রতি মতের কিছু কিছু অনস্বীকার্য অংশ আহরণ করে তাদের সমবায়ে একজাতীয় সামগ্রিক মতবাদ গঠন করতে হবে এবং তার প্রেক্ষিতে পথ নির্দেশ করতে হবে। এটা কোন

'কাজের কথা'ই নয়. এতে কোন প্রাণস্পন্দন থাকে না ; অন্ততঃ রামকৃষ্ণদেব 'যত মত, তত পথের' এ-জাতীয় অর্থ করতে চান নি। অর্থ এও নয় যে, উচ্চ-নীচ পর্যায়ে বিভিন্ন মতবাদ সাজিয়ে তদনুযায়ী এক পথ থেকে অন্য পথে ক্রমোন্নীত হতে হবে। খাঁটি মতগুলির কোনটিই অপর একটির উচ্চে বা নীচে নয়। অন্তত, রামকৃষ্ণদেব সে-কথা বলতে চান নি।

সব পথই সমভাবে সার্থক—এতে বিভ্রান্ত হবারও কিছু নেই। রামকৃষ্ণদেব যদি শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতেন তাহলে অবশ্যই বিভ্রান্তি ঘটতো। কোন পথ আমি অবলম্বন করব বুঝতে পারতাম না, এবং ফলে স্বৈরাচারী হতাম , অথবা কোন 'কাজ' না করে, সব পথই সমান—এই চিন্তা'বিলাস' বা ঔদার্য'বিলাসে' মোহগ্রস্ত থাকতাম। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সম্প্রদায় বা স্বভাব বা স্বধর্ম অনুযায়ী আমার পথ নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অথবা যোগ্য গুরু আমার সম্প্রদায় স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী আমার পথ নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং সেই পথ অনুযায়ী আমাকে সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন অথবা/এবং অধ্যাত্ম চর্চা করতে হবে।

'অথবা/এবং'—এই শব্দটি এক মহান সত্যের ইঙ্গিত বহন করে। রামকৃষ্ণদেব সেই সত্যই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর দ্বিতীয় বাণীতে 'ভাবমুখে থাক'। যদি কেউ অধ্যাত্মচর্চার অজুহাতে সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে—সহজ কথায়, সুখদুঃখময় জগৎসংসার থেকে—নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়, তার প্রতি রামকৃষ্ণের অনুশাসন হচ্ছে—"না, অত সহজে নিজেকে গুটিযে নেওযা চলবে না।" যে মা জগদম্বা আধ্যাত্মিক ইষ্টার্থের দিকে আমার মন ঘুরিয়ে দেন তিনিই তো যাবৎ জীবকেন্দ্রিক এই সুখদুঃখময় জগৎটাও সৃষ্টি করেছেন। এ-সৃষ্টি বৃথা, নিছক মিথ্যা মাযাময, হতে পারে না। এটাকেই তাঁর নির্দেশমতো যথাযথ গুছিয়ে নিতে নিতে অধ্যাত্মপথে অগ্রসব হতে হবে। পলায়নপর মনোবৃত্তিতে প্রথম থেকেই একে 'দূরাপাস্ত' বলে ছেড়ে চলে যাওয়া চলবে না। তিনিই এটাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে নিছক অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে পারেন যিনি সমস্ত জাগতিক ঋণ পরিশোধ করেছেন (এ-জন্মেই হোক অথবা পূর্বতন জন্মেই হোক)। কিন্তু তাঁর পক্ষে তখন জগৎ পরিত্যাগ করাও যা জীবন্মুক্তরূপে নিস্পৃহ চিত্তে জগতে কাজকর্ম করে যাওয়াও তাই। তবুও যদি তিনি আশে-পাশে পিছনে কোন দিকে না তাকিয়ে শুধু সামনের দিকে চেয়ে সরাসরি ব্রহ্মলগ্ন হতে চান, ক্ষতি নেই। কিন্তু এ অধিকার শুধু 'কোটিতে গুটিক' জীবন্মুক্ত বা প্রায়-জীবন্মুক্ত পুরুষেরই আছে। অন্যদের পথ হলো জাগতিক কাজকর্মের দায়দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই অধ্যাত্মচর্চা। আবার যাঁরা সাধনমার্গে বা অন্য ভাবে

ভগবত্তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করেছেন তাঁরাও ইচ্ছা করলে বা গুরুনির্দেশে সুখদুঃখময় এই জগতে ফিরে আসতে পারেন এবং জগৎকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। ব্রহ্মলীন হয়ে যাবার চেয়ে এই ভাবে জগৎ-কল্যাণে ব্রতী হওয়া এঁদের কাছে কোন ভাবেই ন্যূনতর নয়; অনেকের মতে, পূর্ণতর। রামকৃষ্ণদেব নিজেই এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। শান্ত সমাধিতে চিরমগ্ন না হয়ে লোকগুরু রূপে জগৎকল্যাণে ব্রতী হবার নির্দেশ সমাধি অবস্থাতেই তিনি 'মা'র কাছ থেকে পেয়েছিলেন। 'ব্যুত্থানে'র মুখে অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি বলে উঠলেন, "ভাবমুখে থাক।"

জনকল্যাণ বলতে তখন লোকে বুঝত জীবে দয়া। এখনও অনেকে তাই বোঝেন। রামকৃষ্ণদেব বললেন, যে-অর্থে 'দয়া' শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে অত্যধিক স্ফুট থাকে উপকারীর অহেতুক আত্ম-মহিমাবোধ এবং তদনুপাতে উপকৃতের মর্যাদাহানি। এতে আধ্যাত্মিকতার, প্রকৃত মূল্যবোধের, অপহ্নবই ঘটে। অতএব, দয়ার পরিবর্তে তিনি উপদেশ দিলেন সেবাধর্মের। তাও লোক-দেখানো অথবা নিছক নিয়মমাফিক আনুষ্ঠানিক সেবা নয়। সেই সেবাই ধর্ম, সেই সেবাই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত, যাতে সেবিতের মানুষ-মর্যাদা, ভগবত্তা, স্বীকৃত হয়। আমিও যেমন শিবের অংশ, যার সেবা করছি সেও তাই; সকলেই মানুষ ও তদংশে শিব; আর দশজনের তুলনায় আমার মূল্য কাণাকড়িও বেশি নয়; জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিপত্তি ভোগে আমার যতটা অধিকার অপরেরও প্রকৃত অধিকার ততটাই—এই বোধেই জীবসেবা রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ। এর চেয়ে বড় সাম্যবাদ আর কী হতে পারে?

বর্তমান গ্রন্থে সাধক-জ্ঞানী গ্রন্থকার রামকৃষ্ণের তিন অমর বাণীর এই-জাতীয় অর্থ অতি বিশদ ভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর লিখনশৈলী অসাধারণ। রামকৃষ্ণের জীবনী ও সাধনপরিক্রমা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, দার্শনিকের ভঙ্গিতে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করে সবিশেষ বিচারও করেছেন। অথচ গ্রন্থটি পাঠ কালে মনে হয় সব কথাই যেন তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে স্বত-উৎসারিত।

গ্রন্থকার আরও দেখিয়েছেন যে, রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী খাঁটি ভারতীয় জীবন ও ভারতের চিরন্তন বাণী। ভারতেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, এবং বিশেষ করে আধুনিক ভারতে, এই ভারত-জীবন ও ভারত-বাণীর অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। আধুনিক ভারতের বিপর্যয় তিনি অল্প কথায়, কিন্তু একেবারে সরাসরি, দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং দেখিয়েছেন যে,

এগার

এখনও-অনস্তর্হিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রভাব পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে ভারত তার শাশ্বত ধর্মে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তিনিই প্রকৃত শিল্পী যিনি কোন ব্যক্তির আলেখ্য রচনায় কেবল সেই সেই দিক ফুটিয়ে তোলেন ঠিক যেখানে যেখানে ঐ ব্যক্তি অনন্যসাধারণ। রামকৃষ্ণদেবের জীবন অঙ্কনে গ্রন্থকার এ-জাতীয় শিল্পকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। জগৎকল্যাণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হোক মা জগদম্বার কাছে সেই প্রার্থনা জানাই।

কালিদাস ভট্টাচার্য

প্রস্তাবনা

তিনটি অধ্যায়ে লিখিত 'রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা' রচনাখানি রামকৃষ্ণ 'ফেনোমেননে'-র বিস্তার। কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরের পূজক ও সাধক রামকৃষ্ণ এবং লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অলৌকিক কার্যাবলীর আলোচনার মধ্যে এই বিস্তার সীমিত। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে প্রতিটি অধ্যায় ভিন্ন হলেও সমগ্র রচনাটি একই অভিন্ন সত্তার অভিব্যক্তি ও প্রকাশ। প্রথম অধ্যায়ে বালক গদাধরের বাল্যলীলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন বালক গদাধরের মানসিকতা, তাঁর জীবনের লক্ষ্য, কৌল সংস্কার, পরম্পরা, পরিবেশ, প্রতিবেশ প্রভৃতি। বিশেষ এক যুগসন্ধিক্ষনে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে গদাধরের আগমনের হেতু কি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, না দৈবী করুণা, না উভয়ই— ইত্যাদি বিষয় সকল এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। তা-ছাড়াও এই অধ্যায়ে একটা মৌল প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সাধক রামকৃষ্ণ কি গদাধর-সত্তার অভিব্যক্তি, না উত্তরণ, না উভয়ই? উত্তরণ বা অতিক্রান্তি নামক যে শব্দটি বর্তমান রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে তাকে আমরা সাধারণ ভাবে ইংরেজীতে ট্রানসেনডেন্স বলি।

প্রশ্ন—উত্তরণ বা অতিক্রান্তি বলতে আমরা কি বুঝি?

লৌকিক দিক থেকে আমাদের জীবন-অভিজ্ঞতা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, প্রধানতঃ আমরা যা কিছু করি তা কম-বেশী জৈবিক প্রেরণায়, দেহের (বস্তুর) ক্ষুধা ও তার অভাব মেটানই যেন সাধারণ জীবনের মূল লক্ষ্য। সংসারের সব কিছু আমরা দেহের ভাষায় বা দেহের ভাষার বিস্তার হিসাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি। এবং ঐ ব্যাখ্যাপোযোগী 'লজিক' তৈরী হয় আমাদের আচরণের যৌক্তিক সমর্থনের পক্ষে। অভিজ্ঞতার প্রাথমিক স্তরেই প্রকৃতি-জগতে অনির্দিষ্ট একটা কিছু 'দত্ত' হিসাবে যে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় এবং আমরা যে তা স্বীকার করি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং ঐ অনির্দিষ্ট 'দত্ত' যে আমি-নিরপেক্ষ 'বিষয়' তাও অস্বীকার করা যায় না। ফলে, প্রথম থেকেই অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রে একটা দ্বৈতাবস্থার সৃষ্টি হয়। এক দিকে সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি নামীয় একটা কিছু, অভিজ্ঞেয় জগতে যা কিছু ঘটছে তার পটভূমি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, অপর দিকে জীবজগতের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ হিসাবে মনুষ্য নামীয় এক বিশেষ ধরনের

জীব প্রকৃতি-জাত হয়েও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে নতুন করে প্রকৃতিকে সাজাবার চেষ্টা করে চলেছে। পূর্বোক্ত 'বিষয়' (প্রকৃতি), ও 'বিষয়ী' (আমি)—উভয়ের সংযোগ ও তা থেকে উত্তরণ হল সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের লৌকিক জীবনকে চালিত করে। কামারপুকুরের বালক গদাধরের জীবন-অনুভব, অর্থাৎ যা নিয়ে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন তা একটু অন্য ধরনের। অর্থাৎ, তিনি প্রচলিত পথে জীবন শুরু করেন নি।

একটু অন্তর্মুখ ও আত্ম-সচেতন হলেই বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়, ভাব থেকেই আত্ম-অনুভবের বোধ আসে। মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ ও তা লাভ করবার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অতি বাল্যাবস্থা থেকেই গদাধরের মনে ছিল। সংসারের অনিত্যতা এবং নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য জীবন পণ করে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, সবই তিনি ঐ সময় লক্ষ্য করেন। তা-ছাড়াও প্রকৃতির সব-কিছুর মধ্যে-যেমন, পাখীর গান, নদীর কলতান, আকাশের নীল—তিনি দিব্য সৌন্দর্যের আভাস পেতেন। এই অধ্যায়ে সে-ঘটনারও কিছু উল্লেখ আছে। সূক্ষ্ম শিল্পী-মানসে যে-সব স্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায় বালক গদাধরের মধ্যে তা পুরোপুরি পাওয়া যায়। ফলকথা, গদাধর যে অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন সে-বিষয় কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বাল্যকালে অনেকের আচরণের মধ্যে অসাধারণত্বের লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকে জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে যেতে পারেন না, আবার বিপরীত মুখে, বাল্যকালে অনেকে অতি সাধারণ হয়েও পরিণামে অসাধারণ হয়েছেন, এ সকল বিষয়েও বর্তমান অধ্যায়ে কিছু বলা হয়েছে।

পূর্বোক্ত অতিক্রান্তি বা উত্তরণ সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হবে।

ব্যক্তিক চেতনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণত মানুষের মন কোন একটা বিষয়বিশেষের স্তরে বদ্ধ থাকে না। চঞ্চলতা মনের ধর্ম, কল্পনায় মানুষ অনেক দূর যেতে পারে, এমনকি দেশ-কালের গণ্ডীকেও অতিক্রম করতে পারে। এই কাল্পনিক বিচরণকে বর্তমান গ্রন্থে উত্তরণ বা অতিক্রান্তি বলা হয় নি। সু-সাহিত্য, চারুশিল্প, ধর্ম প্রভৃতির অনুভব ক্ষেত্রে কখনও কখনও মানুষ অতিক্রান্তির আভাস পায়, কিন্তু সেটা কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়; তাই ঐ সকল অনুভব অন্তরে বাসা বাঁধে না, চিত্তে বসে না। কারণ, ঐ সকল মানুষকে আবার দেহস্তরে নামতে হয়, এমন কি জৈবিক প্রেরণায় চালিত হতে হয়। তবে একথা ঠিক, ঐ সকল অলৌকিক অনুভব সাময়িক ভাবে মনে আনন্দ দেয়, চিত্তে প্রশান্তি আনে।

বুদ্ধির দুটি মৌল লক্ষণ হল সামান্যভাবনা ও আত্মসচেতনতা। বৌদ্ধিক স্তর অতিক্রম করলে জীব-চেতনার চরম স্তর সাক্ষিতা (জীব সাক্ষী)। ঐ স্তর ব্যবহারিক চেতনার উর্ধ্বে হলেও অধ্যাত্ম দিক থেকে ঐ স্তরেও অতিক্রান্তি পুর্ণতা লাভ করে না। পুর্ণতার লক্ষণ হল 'হওয়া'; এই হওয়াই অধ্যাত্ম দিক থেকে একমাত্র স্থায়ী। কার্যকারণ-নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি-জগৎ দেশ-কালের গণ্ডীতে বদ্ধ, অধ্যাত্ম জগৎ ঐ গণ্ডীর উর্ধ্বে। আত্মোপলব্ধির ভাষায় সে-জগতের সন্ধান পাওয়া যায়।

অধ্যাত্ম দিক থেকে বিষয়টি এই ভাবে বলা যায়। একটি বিন্দুকে (রিয়ালিটি) কেন্দ্র করে যদি একটি বৃত্ত টানা যায়, এবং সেই বৃত্তের পরিধিকে যথেচ্ছ বিস্তার করা হয়, তা হলে ঐ বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা সাধারণ ভাবে অনুভব-সাপেক্ষ জগৎ বলি। ঐ বিন্দু থেকে যত আমরা দূরে সরে যাই ততই আমরা নাম-রূপময় জগতের মধ্যে ডুবি এবং আত্মস্বরূপ ভুলে যাই। বিপরীত মুখে, আমরা যদি নাম-রূপময় জগতের উৎস-শক্তির সন্ধান করি তা হলে ক্রমেই আমরা এক স্পন্দনাত্মক অখণ্ড মহাপ্রাণের খোঁজ পাই, যে মহাপ্রাণ-শক্তি পূর্বোক্ত বিন্দুর বহির্মণ্ডলে দুর্নিবার ঘুরে চলেছে। ঐ বৃত্তের কেন্দ্রস্থ বিন্দুর অন্ত্য স্বরূপে মন যখন স্থিতি লাভ করে তখন ঐ মন ব্রহ্মে একাত্ম হয়েছে বলা যায়। ব্রহ্মে একাত্ম হওয়াই প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম দিক থেকে অতিক্রান্তি বা উত্তরণ। শক্তি-চেতনার দিক থেকে ঐ উত্তরণই পুর্ণতার শেষ কথা কি না, সে-প্রশ্ন এখানে না তুলে এইটুকু বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরাও অধ্যাত্ম স্তর থেকে নেমে 'বহুজনহিতায়', 'বহুজনসুখায়' সংসারে কাজ করে গেছেন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-চেতনার ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণ সাধনার ঐ স্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং অধ্যাত্ম রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তার কিছু কিছু আভাস দিয়ে গেছেন। এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কেও কিছু কিছু বলা হয়েছে, পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণের সাধনার সূত্র ধরবার জন্য। এখানে উল্লেখ্য, ব্যবহারিক জগতে মন যখন কোন বিষয়বিশেষে একাত্ম হয়, তার পরক্ষণে ঐ বিষয়ের অনুভবের মধ্যে উত্তরণের আভাস পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল 'সাধক রামকৃষ্ণ-দক্ষিণেশ্বর।' সতের বছর বয়সের উদাস, বিবাগী গদাধরের কলকাতায় আগমন, রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মা-ভবতারিণীর মন্দিরে কর্ম গ্রহণ, এবং শেষ পর্যন্ত মা-ভবতারিণীর পূজক পদে অধিষ্ঠান ইত্যাদি। স্বভাব-সাধক

রামকৃষ্ণের সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, সিদ্ধি ক্রিয়ায় এবং উন্মেষ জ্ঞানে, ইত্যাদি বিষয় সকল এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। রামকৃষ্ণ-সাধনার মৌলিকতা ও অনন্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলা হয়েছে। পিতার আদর্শ ও প্রারব্ধের যে গৈরিক বীজ নিয়ে গদাধর সাধন-রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, ধীরে ধীরে সেই বীজ সাধক রামকৃষ্ণে অভিব্যক্ত হয়েছিল। গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও সাধক রামকৃষ্ণ—উভয়ের মানসিকতায় কোন গুণগত পার্থক্য নেই, ব্যাপ্তি বা বিস্তারের দিক থেকে যে পার্থক্য দেখা যায় তা প্রারব্ধের ভাষায় পরিমাণগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সিদ্ধ-সাধক লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা সাধক রামকৃষ্ণ যখন পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি প্রারব্ধের গণ্ডী অতিক্রম করে গেছেন এবং গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস এবং তাঁর ইহজীবনের জাতি, আয়ু, ভোগ, সবই তিনি সাক্ষী-দৃষ্টিতে দেখেছেন। অতএব, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণ এবং লোক-গুরু সিদ্ধ-সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—এই তিন সত্তা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, আবার অভিন্ন হয়েও ভিন্ন। ভিন্ন, কারণ সাধক রামকৃষ্ণের দৃষ্টি ব্যবহার-ঊর্ধ্ব হলেও অধ্যাত্ম ভূমিতে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, পূর্ণতা-প্রাপ্ত সিদ্ধ-সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দৃষ্টি পুরোপুরি অধ্যাত্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্যবহার-ভূমিকে তিনি কোন প্রকারে উপেক্ষা করেন নি। সমাজ-কল্যাণের ব্রত কৃত্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন। বর্তমান অধ্যায়ে সে-বিষয় কিছু আলোচনা আছে। অভিন্ন, কারণ পূর্বোক্ত তিনটি সত্তাই একই অখণ্ড চৈতন্যের স্তরভেদ।

তাছাড়াও, এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয় হল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘ বারো বছর সাধনার একটা সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ। ঐ নানা ধরনের সাধনার মধ্যে তন্ত্রোক্ত শক্তি-সাধনা ও বৈদান্তিক সন্ন্যাস গ্রহণ ও নির্বিকল্প সমাধিতে উত্তরণের কথা বিশেষ স্থান পেয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের তন্ত্রোক্ত শক্তি-সাধনা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রোক্ত সাধনায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র-সাধনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শক্তিগ্রহণ না করেই তিনি বীরাচারী সাধনায় কৃতকার্য হন। আজন্ম ব্রহ্মচারী রামকৃষ্ণের পক্ষে কোন দুরূহ সাধনায় উত্তীর্ণ হতে তিন দিনের বেশী সময় লাগে নি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে সাধনায় উত্তীর্ণ হতে তোতাপুরীর মত সন্ন্যাসীর দীর্ঘ চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল সাধক রামকৃষ্ণ তা তিন দিনেই শেষ করেছিলেন। তন্ত্র-সাধনার পর তিনি বৈষ্ণবোক্ত ভাবাশ্রিত সাধনায় মন দিলেন এবং বৈষ্ণব ভাবের চরম

স্তরে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে অদ্বৈত সাধনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখা দিল। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরীর অধীনে থেকে অল্প সময়ের মধ্যে অদ্বৈত-সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, যে সব দুরূহ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে সাধকদের দীর্ঘদিন সাধনা করতে হয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ এত তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ত করলেন কী করে? উত্তরে বলা যায়, সাধনার পরম্পরা নিয়ে সাধকরা এ পৃথিবীতে আসেন, ফলে পূর্বজন্মার্জিত সাধনার সঙ্গে এ-জীবনের সাধনার যোগসূত্র স্থাপিত হলেই সাধনা দ্রুত এগিয়ে যায়। ঈশ্বর-প্রেরিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধক জীবনে সম্ভবত তাই ঘটেছিল। তাছাড়াও, যে-সকল সাধক সাধিকা রামকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন পরবর্তী কালে সেই গুরুদের প্রত্যেকের সাধনার পূর্ণতা রামকৃষ্ণের সাধনার মাধ্যমে ঘটেছিল। এখানেই রামকৃষ্ণ-সাধনার অনন্যতা। রামকৃষ্ণ সাধনার শেষ সাধনা রহস্য-পূজা—নিজের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে আত্মনিবেদন। তন্ত্রশাস্ত্রে রহস্য-পূজার বিশেষ বিধি নির্দিষ্ট আছে, জগতে যা যত গভীর তা তত রহস্যে ঘেরা। অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সাধারণ বিধি-নির্দিষ্ট ক্রিয়া ছাড়াও আধ্যাত্ম জগতে এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা অতি গুহ্য। যেমন জীবদেহে কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ, বীজমন্ত্রে দীক্ষা দান, সৎগুরুমুখাৎ মহাবাক্য শ্রবণ ইত্যাদি। বিবাহিত স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূজার অর্থ হল নারী শক্তিকে দৈবী শক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং কামকীট দগ্ধ করে দেহাদি কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। রামকৃষ্ণের সাধনার আর একটা বড় দিক হল, সম্প্রদায়গত দিক থেকে সাধন ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা যে-সব তথাকথিত জাত-বিচার দেখি সাধক রামকৃষ্ণ তা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। একজন দিব্যাচারী শক্তি-সাধক যে স্বচ্ছন্দে ভক্তিমার্গের চরম স্তরে উঠতে পারেন এবং পরম ভক্ত হয়েও যে শম-দমাদি সাধন চতুষ্টয়-সম্পদ লাভ করে সেই একই সাধক যে অদ্বৈত স্তরে নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হতে পারেন, সাধক রামকৃষ্ণ তা নিজ সাধনার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। ফলে ধর্ম-জগতে সাধক রামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব আবিষ্কার হল 'যত মত, তত পথ'—এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার চরম উপলব্ধিগত অনুভব হল 'ভাবমুখে থাক'—অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হয়েও একজন মুক্ত পুরুষ যে 'বহুজন হিতায়' নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে যেতে পারেন, তা সাধক রামকৃষ্ণ নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যে সংসারে লোকহিতকর কাজ করা যায় তা ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রমাণ করে গেছেন। অতএব, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি,

প্রেম,—সবই রামকৃষ্ণের সাধনায় স্থান পেয়েছে, স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্যবস্তু বজায় রেখে। ফলে, সম্প্রদায়গত দিক থেকে তৎকালে ধর্মক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল সাধক রামকৃষ্ণ সে সমস্যার সমাধান করে গেছেন। রামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত চরম উপলব্ধিগত অনুভব 'ভাবমুখে থাক' ব্যবহার-ভূমিতে 'জীবে দয়া'র পরিবর্তে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'-র রূপ পেল এবং সমাজ সেবায় এক নতুন ভাবচেতনার উদয় হল। অতএব, রামকৃষ্ণ সাধনার তিনটি ফল, অধ্যাত্ম রাজ্যে **'ভাবমুখে থাক'** ধর্মাচরণক্ষেত্রে **'যত মত, তত পথ'** এবং ব্যবহার-ভূমিতে (সমাজজীবনে) **'শিব জ্ঞানে জীবের সেবা'**। আরোহণের দিক থেকে নিষ্কাম কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে মানুষ অধ্যাত্ম সাধনার চরম স্তরে উঠতে পারে, আবার অবরোহণের দিক থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করে সাধক জনকল্যাণের জগতে নামতে পারে। সাধারণ মানুষের নীচে থেকে উপরে ওঠাই শ্রেয়, আবার সাধকদের পক্ষে উপর থেকে নীচে নামাই বিধেয়। রামকৃষ্ণ 'ফেনোমেনন' বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পূর্বোক্ত তিনটি বাক্য ও তার মধ্যেকার-সংহতি একই অভিন্ন সত্তার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে লোকগুরুরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জনজীবনে প্রতিষ্ঠা, তাৎকালিক সমাজজীবনে রামকৃষ্ণের দান, ভক্ত শিষ্যদের মধ্য দিয়ে এক নতুন পরম্পরার সূচনা ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ এখানে আলোচিত হয়েছে তৎকালীন সমাজ চেতনায় রামকৃষ্ণের মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য দেখাবার জন্য। এবং ঐ রেনেসাঁর প্রভাবে ধর্মাচরণ ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে কিছু বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম জীবনের উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন সম্পর্কে প্রসঙ্গত সেখানে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, রামকৃষ্ণ-সাধনার বাস্তব মূল্য নিরূপণের জন্য। সামগ্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ-সাধনা যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার কিছু আভাস এখানে দেওয়া হয়েছে প্রকৃত ভারতীয়তার স্বরূপ নির্ধারনের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য গৃহীভক্তদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছাড়াও, সাধারণ মানুষদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী ভাবে চলা উচিত সে-সম্পর্কেও এই অধ্যায়ে কিছু বলা হয়েছে। সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী কি সমকালীন, না সর্বকালীন ও সর্বজনীন, সে সম্পর্কেও এখানে একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

ভারতবর্ষে একটানা পাঁচ হাজার বছরের পতন-অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় অভ্যুদয় (বৈষয়িক উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স

(অধ্যাত্ম মুক্তি) ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরায় এক সঙ্গে পাশাপাশি চলে এসেছে। অভ্যুদয়ের কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অধ্যাত্ম মুক্তির উপর সময়বিশেষে অহেতুক বেশী জোর দেওয়া হলেও সেটা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক পরম্পরা নয়। তবে এ-কথা ঠিক, ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, সেখানে অধ্যাত্ম-সাধনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অন্যান্য দেশ থেকে অনেক বেশী হওয়ায় ভারতীয়দের জীবনধারা ও জীবনের লক্ষ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বতন্ত্র। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য বিচার থেকে আরম্ভ করে নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিক ভাবনা ভারতীয় জীবনধারায় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারত—ভৌগোলিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ হল, প্রাচীন ভারতবর্ষ কতকগুলি স্বয়ংশাসিত ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে শৌর্য-বীর্যের দিক থেকে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতেন এবং অন্যান্য রাজারা তার আনুগত্য মেনে নিতেন। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট সনাতন ভারতবর্ষ বহুভাষাভিত্তিক ও নানা সংস্কৃতির এক বিচিত্র দেশ।

সেদিনের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় গ্রাম ছিল দেশের প্রাণ, কারণ প্রকৃত গ্রামীণ শিক্ষাই হল প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা অর্থাৎ সেই শিক্ষার মাধ্যমে দেশীয় ধারায় এ-দেশের মানুষকে গড়ে তোলা যায়। শহরের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যাদির পথে দূর নিকট বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন। অধুনা বিদেশী শিক্ষার কল্যাণে এবং বিদেশী রাজনীতি ও অর্থনীতি ব্যবস্থার সুবাদে শহর ও গ্রামের একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্ম অনুসারে স্ব স্ব ধর্ম পালন করে প্রজারা কমবেশী সুখে বসবাস করত। ধর্ম ও অধ্যাত্ম দিক থেকে সনাতন ভারতের অন্তরাত্মা এক ও অভিন্ন। অধুনা কেন্দ্রশাসিত ও রাষ্ট্রপতিচালিত একক ভারতবর্ষের পরিকল্পনা মুসলমান আমলে দেখা দিলেও ইংরেজ আমলে শাসন ও শোষনের সুবিধার জন্য ঐ পরিকল্পনা পাকা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এমন এক সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য যখন প্রবল ছিল, এবং ভারতবর্ষের একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক যখন নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ইংরেজ অনুকরণে অন্ধ ও মোহগ্রস্ত। ফলে, সেদিন ইংরেজ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রকৃত ভারতীয়ত্বায় চিন্তা যে কত কঠিন কাজ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ঐ সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরেজ অনুকরণের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন, অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে স্বাজাত্য ও স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন।

১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ ক্ষমতা-হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করল, কিন্তু স্বারাজ্যের কথা, জাতীয় ঐতিহ্যের কথা, সংস্কৃতির কথা, ভারতীয়তার কথা এখনও দূর অস্ত। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবর্তনে আজ আমরা কিছুটা বুঝতে বাধ্য হয়েছি যে ধারকরা বিদ্যা নিঃসম্বল, সে বিদ্যা এমন কিছু দিতে পারে না যা কোন জাতিকে স্ব ভাবে ফিরিয়ে আনতে পারে, বা এমন কোন আদর্শ সৃষ্টি হতে পারে না যার অনুসরণে নতুন কোন মানসিকতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর সমাজ-চেতনার কথা ও ভারতীয়তার চিন্তা জাতির জীবনে আজ একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে তার একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে তথ্যের দিক থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অলৌকিক জীবন, ধর্ম অধ্যাত্ম সাধনা ও সামাজিক কার্যাবলীর উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সে সবের মধ্যে 'শ্রীম'-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (৫ খণ্ড), স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' (১ম ও ২য় ভাগ) গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারা, সমকালীন ক'লকাতার সমাজ-সম্পর্কিত তথ্যাদি শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' রচনাখানি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়াও উনিশ শতকের রেনেসাঁর আলোচনায় স্বর্গত বিনয়কৃষ্ণ দত্তর নাম লেখকের স্মরণে ছিল। কারণ ঐ বিষয়ে দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে লেখকের আলোচনা হয়। 'উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ' পুস্তকখানি এখানে উল্লেখ্য।

'কুন্ডলিনী শক্তি', 'শক্তি ভক্তি' প্রভৃতি 'দ্রষ্টব্য'-র আলোচনায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের "ভারতীয় সাধনার ধারা,' 'তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন' ৺সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণের 'কৌলমার্গ রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 'রামকৃষ্ণ' নামকরণ প্রসঙ্গে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার নাম উল্লেখ্য।

ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণ নাম আজ একটা প্রতীক, অসংখ্য মানুষের প্রেরণার উৎস, ভরসার স্থল। তাই বহু জ্ঞানী-গুণিজন এই গ্রন্থ রচনায় লেখককে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের নাম স্মর্তব্য। গ্রন্থখানির শিরোনামা তাঁর দেওয়া। গ্রন্থের ভূমিকাটিও তিনি লিখেছেন।

বিষয়বস্তুর আলোচনায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ শুনেছেন এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে লেখককে ধন্য করেছেন। লেখকের দর্শনচিন্তার শিক্ষাগুরু ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থেও নানা আলোচনার মাধ্যমে লেখককে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

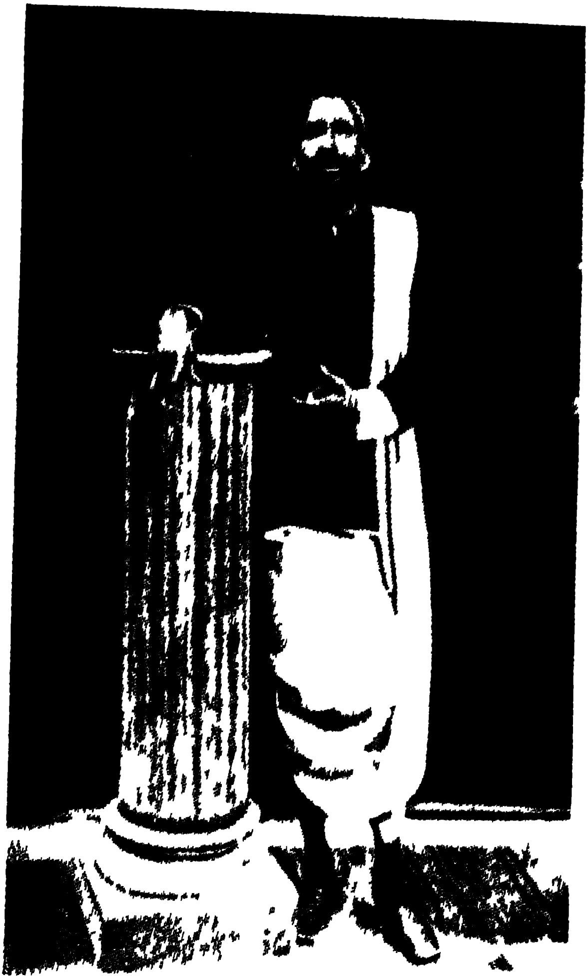
তাছাড়াও যাঁরা এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ অরবিন্দনাথ বসু, (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ তারাভূষণ মুখার্জী (পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ রামপূজন তেওয়ারী, (শান্তিনিকেতন) অধ্যাপক অশোক বিজয় রাহা, (শান্তিনিকেতন), অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার, (শান্তিনিকেতন)।

অন্যান্য নানা দিক থেকে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীনীরদবরণ মুখার্জী, শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, ডঃ বিমানেশ সুর, ডঃ শাশ্বতী বাগ, শ্রীঅরুণকুমার গুপ্ত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযোগব্রত ঘোষ, শ্রীকেতকীরঞ্জন দত্ত, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী (যুগান্তর), শ্রীযতীশ মজুমদার, শ্রীসনৎ দাশগুপ্ত, শ্রীনরেশ সাহা প্রভৃতি। ভগ্নীদের মধ্যে আছেন ডঃ সিপ্রা ঘোষ, ডঃ প্রতিমা সুর, শ্রীমীরা দত্ত, শ্রীধীরা মজুমদার, শ্রীমৃন্ময়ী বসু প্রভৃতি। তাঁরা প্রত্যেকেই লেখকের ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন নবীন শিল্পী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী এবং সবদিক থেকে কাজটা দেখা শোনা করেছেন ছাত্রপ্রতিম তপন চক্রবর্তী। তাঁদের মঙ্গল হোক।

শ্রীমিহির মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড এর কর্মিগণ যত্ন করে বইখানি ছেপেছেন। র‍্যাডিয়্যাণ্ট প্রসেস্ এর শিল্পীগণ ব্লক তৈরী করেছেন এবং ডি. এম বাইণ্ডিং এণ্ড প্রিণ্টিংয়ের ছেলেরা যত্ন করে বইখানি বাঁধাই করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র



শ্রীরামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা

গদাধর চট্টোপাধ্যায়—কামারপুকুর

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টির শুরু থেকে বিবর্তনের স্রোত প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সেই স্রোত কখনও মন্থর গতিতে, কখনও দ্রুত ; আবার কখনও সরল, কখনও বক্র পথে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে, পরিবর্তনের এক অখণ্ড চক্রে বিশ্বপ্রকৃতি ঘুরছে। জড় জগতে এ-পরিবর্তন ধরা যায় বিবর্তনের ক্রমিক ধারায়, পরিমাণগত দিক থেকে, প্রায়োগিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে। চেতনার বিবর্তন জানা যায় অধ্যাত্ম চিন্তায় বা মননে। আবার জনমানসের অলক্ষ্যে ইতিহাস নিত্য নতুন সৃষ্টি করে চলেছে ; এবং যা ছিল অব্যক্ত তা ব্যক্ত হয়ে আবার অব্যক্তে বিলীন হচ্ছে। মানবজীবনের ইতিহাসের কোন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এমন সব বিস্ময়কর, অসাধারণ ঘটনা ঘটে যাকে বিশেষ অর্থে **'আধ্যাত্মিক ফেনোমেনন'** বলা যায়। অসাধারণ এই অর্থে যে, ঐ সকল ঘটনা সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে ধরা যায় না। বিস্ময়কর, কারণ যার চিন্তায় বা মননে চিত্তে গভীর প্রশান্তি অনুভূত হয়। লৌকিক অর্থে প্রকৃতি-জগতে যে-কোনো ঘটনাই 'ফেনোমেনন' পদবাচ্য। 'ফেনোমেনন' [১] সব সময়ই তথ্যনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। কিন্তু এমন সব বিশেষ 'ফেনোমেনন' আছে যেগুলি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত পাওয়া যায়। জাগতিক দিক থেকে জীবসত্তা ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক বিস্ময়কর ফলশ্রুতি, আধ্যাত্মিক দিক থেকে আবার ঐ জীবসত্তাই চৈতন্যের উপাত্ত দিয়ে সৃজনী-শক্তির প্রভাবে জড়-প্রকৃতিকে নতুন করে সাজায়, সাধারণ মানুষকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান গ্রন্থে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জগতের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হবে, উত্তরকালে যার প্রভাব ভারতীয় জনমানসকে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং য়ুরোপের বহু মনীষীকে নতুন ভাবে ভাবিত করেছিল। ঘটনাটি ঘটে বাংলা ১২৪২ সালের (ইং ১৮৩৬) ৬ই ফাল্গুন বুধবার। ঐ দিন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে গদাধর চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্ম ইতিহাসে ঐ ঘটনাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী-দক্ষতা যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এই পরিবেশে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা আলোচনার অবকাশ কোথায়? বাস্তব দিক থেকে প্রশ্নটি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবনে প্রায়োগিক বিজ্ঞান এবং

আধ্যাত্মিকতা বা পরাবিদ্যা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, উভয়ের লক্ষ্যবস্তু হল মূলত সত্যানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান; ব্যবহার-ভূমিতে উভয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণ, পৃথিবীকে সুন্দর ও সুসংহত করে তোলা। জীবনধারণের উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় বাদ দিলে প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ের কোনটিরই কোন মূল্য থাকে না। ব্যবহার-ভূমিতে প্রায়োগিক বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য, আবার পরিপূর্ণ জীবন ও জীবনের পরম লক্ষ্যের দিক থেকে বিচার করলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞান যেমন মানব-জীবনের দেহ-ধারণের চাহিদা মিটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা তেমনি মানসিক উন্মেষ ও চিত্তের ধৈর্যের মাধ্যমে মনুষ্য-জীবনকে সংযত ও সংহত করে পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তথ্য ও মূল্যায়ন বা মূল্যবোধ—উভয়ের অনুশীলন ও সঙ্গতির মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা। প্রকৃতি[২] জগতে জড়শক্তি সক্রিয়, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জগতে চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ; উভয়ই আদি চৈতন্যশক্তির প্রকারভেদ। ঐ আদি শক্তি তন্ত্রমতে শিবসীমন্তিনী, অক্ষতা কুমারী, ব্রহ্মস্তরে ইনিই ব্রহ্মময়ী। জড়শক্তি-প্রকাশের জন্য চৈতন্য-শক্তি অপেক্ষিত, কিন্তু চৈতন্য-শক্তি স্বয়ংপ্রকাশ, অর্থাৎ জড়শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে উল্লেখ্য, জড় অনড় নয়, যা নিয়তপরিবর্তনশীল ও সর্বদা পরিণামী তাকেই আমরা জড় আখ্যা দিই, আর স্বয়ংপ্রকাশরূপে চৈতন্যশক্তি স্থায়ী ও চিরন্তন।

ঐ চৈতন্যশক্তির মূর্ত প্রকাশ রূপে রামকৃষ্ণ এসেছিলেন আমাদের মধ্যে, যুগের প্রয়োজনে, ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে সবচেয়ে পুরাতন কথা নতুন করে শোনাবার জন্য, যুগান্ধ মানুষকে জ্ঞানের আলো দেওয়ার জন্য। তাই একালের সমস্যা-জর্জর পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে যত বেশী আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা শক্তি-চেতনার উৎস। তাঁর বাক্য ব্রহ্মবীজ, তা কখনও নষ্ট হবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সকল দেশের মনীষীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাঁর কথা মানবজাতির অমূল্য সম্পদ।

আপাত-তুচ্ছ অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে যে অসাধারণ তত্ত্ব লুকিয়ে থাকতে পারে তার প্রমাণ মেলে, মাটিতে আপেল পড়ে, এই অতি সাধারণ চলতি ঘটনা ও তা থেকে নিউটনের যুগান্তকারী মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের মধ্যে। বিজ্ঞান-জগতের বিস্ময়কর আবিষ্কার সকলের ইতিহাস আলোচনায় অত বড় না হলেও ঐ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনার আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মানবজীবনের ইতিবৃত্তের মধ্যে ঐ ধরনের দৃষ্টান্তও খুব কম নয়।

শবদেহ দেখে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাস-গ্রহণ ও পরে বোধিলাভ, সে দিনও জমিদার লালাবাবুর জীবনে 'বেলা গেল' এই কথাটির আবেদন ও পরবর্তীকালে সন্ন্যাস-গ্রহণ—সবই ঘটনার দিক থেকে অতি সাধারণ হয়েও পরিণামে অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাধারণ এই অর্থে যে, প্রকৃতি-জগতে সব সময় ঐ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমরা সব সময় অনেক কিছু দেখছি, শুনছি, কিন্তু আমাদের মনে তার জন্য কোনো স্থায়ী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কোনো অনুপ্রেরণা জাগে না কেন? মানুষের উপাদান-অংশে, তার আচরণে এমন কতকগুলি সহজাত সংস্কার আছে যা জন্ম থেকেই তার ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেই ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করলে তার প্রারব্ধ[৩] বা ভবিতব্য সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক ঘটনার ইতিহাস ও মনুষ্যজীবনের ইতিবৃত্ত উভয়ের আলোচনায় প্রাথমিক স্তরে বিষয়বিশেষে পরিমাণগত অনেকখানি মিল দেখা গেলেও গুণগত অমিলও খুব কম নয়। লাক্ষণিক বিচারে প্রাকৃতিক ঘটনাকে অনেকখানি বিশ্লেষণ করা যায়, মানুষের একটা অস্পষ্ট ছবিও দেওয়া যায় ঠিক, কিন্তু মানুষ স্বরূপত দেশ-কালের ঊর্ধ্বে, সেই স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে চাই এমন এক সাক্ষী-সুলভ আন্তর দৃষ্টি যা তাকে নিয়ে যায় ব্যক্তি-চেতনার ঊর্ধ্বে প্রজ্ঞার রাজ্যে, যার স্বচ্ছ আলোকে মানবজীবনের বহু গূঢ় রহস্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণ ভাবে জীবজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, কিন্তু একমাত্র মানুষই প্রাকৃতিক জগতের এমন এক অনবদ্য সৃষ্টি যার মধ্যে নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা আছে, এবং প্রকৃতিজাত ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকেও একমাত্র মানুষই প্রকৃতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারে, প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাতে পারে। ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট জাগতিক বস্তুসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি 'কাল'; কারণ, কাল-নিরপেক্ষ কোন জাগতিক ঘটনাকে ধারণা ও ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার ঐ কাল-ই মনুষ্যজীবনের সমস্ত বিকল্পের জনক ও অদৃষ্টের নিয়ামক। অধ্যাত্ম-সাধক ঐ কালকেও কুক্ষিগত করতে পারেন প্রারব্ধের গণ্ডী ভেদ করে। চেতনার উন্মেষ ও তার তারতম্য অনুসারে জীব-জগতে মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে গুণগত পার্থক্য তাই অস্বীকার করা যায় না।

আবার মনুষ্য-দেহধারী জীবদের মধ্যে আণব[৪] মল ছাড়াও মায়িক ও কার্মিক মলের তারতম্য অনুসারে স্তরভেদ আছে। মায়িক সংস্কার জীবের দেহ বা ভোগায়তন ও ভোগ্য সামগ্রী প্রভৃতি যোগায়, কার্মিক সংস্কার জীবের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি নৈতিক জীবন নির্ধারণ করে। ফলে, যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে ক'জনই বা তার ভবিষ্যৎ

দেখতে পায়, ক'জনই বা তাকে বুঝতে পারে? পৃথিবীর ইতিহাসে কত লোক এল গেল, কে-ই বা তার খবর রাখে? কালস্রোত নিরবধি চলেছে। সেই স্রোতে কত আদিম সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনুষ্যজীবনের কত দুষ্প্রাপ্য অভিজ্ঞতার স্মৃতি-চিহ্ন। মানব-চেতনার ইতিহাসে তার হদিস মেলে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারায় এখানে গদাধরের বংশ-পরিচয়, পরম্পরা ও যে পরিবেশে তিনি জন্মেছিলেন তার একটা পরিচয় দেওয়া হবে, গদাধরের মানসিকতার সূত্র ধরবার জন্ম। গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ পুরুষ। তাঁর সদাচার সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হবে, কারণ ক্ষুদিরামের আদর্শনিষ্ঠা বাল্যাবস্থায় গদাধরকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

আমরা পূর্বেই বলেছি হুগলী জেলার কামারপুকুরে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর মিশেছে, তারই পাশাপাশি তিনখানি গ্রাম যেন একসঙ্গে মিলে গেছে। গ্রাম তিনখানি হল শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুর। ঐ কামারপুকুরই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

সাধারণত দেখা যায় মহাপুরুষরা সেই সকল দরিদ্র পরিবারেই জন্ম নেন যেখানে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও সন্তোষ আছে, অস্বচ্ছলতার মধ্যেও নিঃস্বার্থ আচরণ ও খাঁটি ভালবাসা আছে, এবং দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ে ত্যাগ, কঠোর সংযম, পবিত্রতা ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল ভাব আছে। কারণ, সম্ভবত পরিণত বয়সে যাঁকে দীন-দুঃখীদের দুঃখ দূর করতে হবে, বঞ্চিতদের জীবনে আশার কথা শোনাতে হবে, তাঁদের যদি দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকে তাহলে তাঁরা বঞ্চিতদের দুঃখ বুঝবেন কি করে? তাছাড়া, সাংসারিক সুখ ভোগে বঞ্চিত ব্যক্তিরাই ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে সর্বদাই ধরে রাখেন। অতএব, সর্বত্র ধর্মগ্লানি হলেও ঈশ্বরের করুণার আভাস দরিদ্রের কুটীরেই পাওয়া যায়। এবং ঐ জন্যই বোধ হয় অধিকাংশ মহাপুরুষই দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। গদাধরের জীবনও পূর্বোক্ত ধারার ব্যতিক্রম নয়। কি অবস্থায় গদাধরের পিতা কামারপুকুরে এসেছিলেন সে সম্পর্কে পরে দ্রষ্টব্য।

গদাধরের জন্মসময়ে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্ধমান রাজের গুরু-বংশীয়দের লাখরাজ জমিদারী-ভুক্ত ছিল, এবং তাঁদের বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীলাল, সুখলাল প্রভৃতি গোস্বামীগণ ঐ গ্রামে বাস করতেন। পল্লী-বাংলায় তখনও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়নি। গ্রামসকল লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ ছিল। শান্তির

ছায়া গ্রামের সর্বত্রই বিরাজ করত। গ্রামবাসীদের দেহে ছিল স্বাস্থ্য ও সবলতা, আর মনে ছিল প্রীতি ও সন্তোষ। গ্রামে আনন্দোৎসবের কোন অভাব ছিল না। চৈত্র মাসে মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশ ঘণ্টা হরিবাসর, বারো মাসে তেরো পার্বণে বাংলার অন্যান্য পল্লীর ন্যায় কামারপুকুরও মুখরিত থাকত। ধর্মঠাকুরের পূজা ছিল ঐ অঞ্চলের এক বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যাপার। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমোর, তাঁতী, সদগোপ, জেলে, ডোম প্রভৃতি উচ্চ নীচ সকল প্রকার জাতির বসতি ছিল কামারপুকুরে, এবং সবাই যার যার কাজ করে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাত। গ্রামে তিন-চারটি পুকুর ছিল, 'হালদার পুকুর' তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড। কামারপুকুর গ্রাম যে এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলের রাসমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ, জীর্ণ দেউল, ইঁটের ভগ্নস্তূপ ও পরিত্যক্ত দেবালয় সকলের মধ্যে। গ্রামের ঈশান ও বায়ু কোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামে দুটি শ্মশান আছে। ভূতীর খালের পশ্চিমে মানিক রাজা নামে পরিচিত একজন ধনী ব্যক্তির সর্বসাধারণের উপভোগ্য এক বৃহৎ আম্রকানন, এবং তা ছাড়াও আমোদর নদ ঐ অঞ্চলের শোভাবর্ধন করে আছে। কামারপুকুরের এক মাইল উত্তরে ভুরসুবো গ্রামে মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী।

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামে পরস্পর-সংলগ্ন তিনখানি সমৃদ্ধ গ্রাম। রামানন্দ রায় ঐ অঞ্চলের একজন প্রজাপীডক জমিদার ছিলেন।

প্রায় ২৫০ বৎসর পুর্বে দেরে গ্রামে মধ্যবিত্ত, অবস্থাপন্ন, ধর্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস ছিল। তাঁরা কুলীন, সদাচারী ও রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়-সমন্বিত পুষ্করিণী 'চাটুয্যে পুকুর' নামে খ্যাত। ঐ বংশে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের ঠাকুরদা শ্রীযুক্ত মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। মানিকরামের তিন পুত্র, তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় (গদাধরের পিতা)। তিনি সম্ভবত বাংলা ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সৎ ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাকা দরকার ক্ষুদিরামের মধ্যে সে সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। ধর্মনিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

প্রায়ই দেখা যায় সংসারে যাঁরা ধর্মনিষ্ঠ ও সৎপথে থাকেন তাঁদের অনেক কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেও জীবনসংগ্রামে পরাজিত হতে দেখা যায়। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য সংসারে যে-সব মহাপুরুষরা আসেন, কৌল পরম্পরায় ধর্ম যাঁদের জীবনের প্রধান উপজীব্য, সে-সব ক্ষেত্রে শত বাধা ও প্রলোভন সত্ত্বেও সদাচারী ব্যক্তিরা কোন অবস্থায়ই

ধর্ম ত্যাগ করেন না। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে এক সময় একটি কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। গ্রামের দুষ্ট জমিদার রামানন্দ রায় কোনো একটি জাল মোকদ্দমায় তাঁকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম রাজী না হওয়ায় জমিদার ক্ষুদিরামকে জব্দ করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করেন। ফলে, ক্ষুদিরামের দেরে গ্রামে থাকবার আর কোন উপায় রইল না। প্রায় দেড় শত বিঘা জমির মালিকানা সত্ত্বেও, বৈষয়িক দিক থেকে একেবারে রিক্ত হবেন জেনেও, চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ক্ষুদিরাম বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সত্য রক্ষার জন্য বিষয় ত্যাগ করবেন সংকল্প করলেন। ছোট-বড় ধর্মের পরীক্ষা ভারতীয় জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। লিখিত সাক্ষ্য ছাড়াও ভারতীয় জীবনধারা একটু তলিয়ে দেখলে তার অসংখ্য প্রমাণ মেলে। ঈশ্বর-বিশ্বাস এ দেশে যে কত প্রবল একজন চাষীর জীবন দেখলে তা বোঝা যায়। সত্য রক্ষার জন্য ক্ষুদিরামের বিষয়-ত্যাগ ধর্মীয় জীবনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্ষুদিরাম ছিলেন একজন সেই জাতের লোক যাঁর নিরাপত্তাবোধের মূলে ছিল ধর্মবুদ্ধিজাত ঈশ্বর-প্রত্যয়, বৈষয়িক সম্পদ নয়। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মিথ্যা সাক্ষ্য না দিয়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার হাত ধরে একদিন অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ান। মিথ্যার কোন প্রলোভনই সেদিন তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। দেরে গ্রাম ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম যেদিন কামারপুকুর এলেন সেই থেকেই চাটুজ্যে পরিবারের কামারপুকুরে বাস।

ক্ষুদিরামের ঐ বিপদের দিনে সুখলাল গোস্বামী, যাঁর নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নিজের বসতবাড়ীর একাংশে ক্ষুদিরামের বাস করবার জন্য কয়েকখানা চালাঘর তৈরী করে দেন এবং সংসার পালনের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক জমি দেন।

কামারপুকুরের জীবনে ক্ষুদিরাম এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দুঃখদৈন্যের মধ্যে মানুষ সংসারের প্রকৃত পরিচয় পায়। একদিকে সংসার যে কত নীচ ও স্বার্থপর, অপরদিকে সেই সংসার যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, সংসারের অনিত্যতা যে মানুষের মনে বৈরাগ্য-উদয়ের সহায়ক, ঐ সময় ক্ষুদিরাম তা সম্যক উপলব্ধি করেন। অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি অনেক সময় মানুষের মনকে ঈশ্বর-অনুগ্রহের দিকে নিয়ে যায়, ক্ষুদিরামের জীবনে ঠিক তাই ঘটল। তাঁর সহজাত ধর্মানুভূতি তাঁকে নানা শিক্ষণীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও বেশী ঈশ্বরনির্ভরশীল করে তুলল। তাঁদের কুলদেবতা ৺রঘুবীরের হাতে নিজকে সঁপে দিয়ে পুজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন।

তথ্য ও মূল্যায়ন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় চিদংশে। তথ্য হল চেতন-নিরপেক্ষ, 'ঠিক যা তাই'; আদর্শ বা মূল্যবোধ চেতনার আলোকে সমুজ্জ্বল, মনুষ্য জীবনের প্রেরণার উৎস। জগতে সত্যবোধে অনুপ্রাণিত তথ্যনিষ্ঠ ব্যক্তির যেমন প্রয়োজন আছে, মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিরও ঠিক তেমনি দরকার আছে। প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ঐ আদর্শকে কাজে লাগাতে চান বাস্তব জীবনে ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই শ্রেণীর একজন আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি যাঁরা সবার উপরে ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সাধারণ হিসাবী মানুষ অনেক সময় আদর্শের কথা বলেন, ঐ সম্পর্কে তাঁরা সময়-বিশেষে আলোচনাও করেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান জীবন ও জীবনের মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গী জড়িত, একমাত্র জীবন ও আচরণের ভিতর দিয়ে ঐ আদর্শের মূল্যায়ন সম্ভব। আদর্শবাদীর জীবনে ব্যক্তিস্বার্থের কোন স্থান নেই। তাঁদের পণ কেবলমাত্র জীবনসর্বস্ব নয়, ধর্ম। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নিজের জীবন দিয়ে ধর্মরক্ষা করে সে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তার প্রমাণ গদাধর বাল্যজীবনে পিতার আচরণ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শনিষ্ঠা কোন তরল ভাবপ্রবণতা নয়, সাত্ত্বিক মনের স্বাভাবিক প্রকাশ।

অলৌকিকভাবে ক্ষুদিরামের রঘুবীরের বিগ্রহশিলা প্রাপ্তি, কুল-দেবতারূপে ঐ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, রঘুবীরের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রভৃতি ঘটনা আজকের দিনে সাধারণ অবিশ্বাসী সন্দেহবাদীদের মনে সংশয় আনলেও, আস্তিক্যধর্মী লোকদের কাছে তথ্য হিসাবে ঐ সব ঘটনা অভিজ্ঞেয় ও স্বীকার্য। মানুষের জীবন বিচিত্র, বিচিত্রতর তার অভিজ্ঞতা। লৌকিক ভাবে ব্যবহারিক জীবন যেমন তথ্যভিত্তিক, মনের দিক থেকে অধ্যাত্ম জীবনও ঠিক তেমনি মূল্যকেন্দ্রিক। একমাত্র আচরণ-সাপেক্ষ অতীন্দ্রিয়ক চিন্তনে অধ্যাত্ম জীবনের মূল্যায়ন সম্ভব। আন্তর রহস্য সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ঐ রহস্যলাভের পক্ষে প্রয়োজন আন্তর্দৃষ্টি। প্রকৃত আন্তর্দৃষ্টি সে-ই লাভ করতে পারে যার জীবনই তার বাণী। একমাত্র বহিরাঙ্গিক লক্ষণ আন্তর রহস্য বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না।

ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার একজন শাস্ত্রজ্ঞ, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সাধক-তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য আদ্যাশক্তি স্বয়ং তাঁর জিহ্বায় মন্ত্রবর্ণ লিখে দেন। রামকুমারের বাক্য-সিদ্ধির অনেক প্রমাণ আছে।

ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐ বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্মশক্তি-জাত। ক্ষুদিরাম ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ধর্মভাব খুব

বেশী ছিল। তাই সম্ভবত তাঁদের পুত্রপুত্রীদের মধ্যে কম-বেশী ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দেখা দিয়েছিল।

বাংলা ১২৪১ সালের শীতকালে ক্ষুদিরাম বারাণসী ও গয়াধাম দর্শন করতে যান। ৺কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করে যখন তিনি গয়াধামে আসেন তখন চৈত্র মাস। মধুমাসে গয়াধামে পিণ্ডদান করলে পিতৃপুরুষদের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। যথারীতি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান করে ক্ষুদিরাম সেখানে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। ক্ষুদিরামের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে এক দিব্যপুরুষ যেন তাঁকে বললেন,—'তোমার ভক্তিতে আমি পরম প্রসন্ন হয়েছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়ে আমি তোমায় সেবা গ্রহণ করব'। কিছুদিন পর (বাংলা ১২৪২-র বৈশাখ) ক্ষুদিরাম গয়া থেকে কামারপুকুর ফিরে এলেন। বংশপরম্পরা ও দেবভক্তির দিক থেকে বিচার করলে ক্ষুদিরামের গৃহে ঐ ধরনের দিব্যপুরুষের আগমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কারণ উচ্চ-প্রকৃতি-সম্পন্ন পিতা ও সাধ্বী মাতা চরিত্রবান পুত্র ধারণের সামর্থ্য রাখেন। আধুনিক বিজ্ঞানও বংশ-পরম্পরার প্রভাব অস্বীকার করে না।

গয়া থেকে ফিরে ক্ষুদিরাম তাঁর স্ত্রী চন্দ্রাদেবীর মধ্যেও অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পেলেন। একটা অপূর্ব দিব্যভাবে তিনি যেন বিভোরা। ক্ষুদিরামের স্ত্রী একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় সংসারধর্ম পালন, অতিথি-সৎকার ও সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা প্রভৃতি ছিল তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কৃত্য। অনেকের চেয়ে তিনি একটু বেশী ভাবপ্রবণ ছিলেন। সরল-বিশ্বাসী এই মহিলার জীবন নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা। গদাধরের জন্মের আগে গর্ভধারণের কাল থেকেই তাঁর নানা অলৌকিক দর্শন হয়। একদিন তিনি দিব্য-দেহধারী এক পুরুষকে নিজেরই শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখেন। আর একদিন তিনি তাঁদের গৃহের অতি সন্নিকটে যুগীদের শিবমন্দিরে পূজা দেওয়ার সময় মহাদেবের দেহ থেকে দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে মন্দির ভরে যেতে দেখেন। তিনি অনুভব করলেন ঐ জ্যোতির রশ্মিচ্ছটা তরঙ্গাকারে তাঁর দিকে ছুটে এসে তাঁর সর্বদেহকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি উপলব্ধি করলেন কোন মহাপুরুষের সন্নিবেশ। মহাপুরুষদের আগমনের পূর্বে ঐ ধরনের অলৌকিক ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায়। ধর্মরাজ্য রহস্যে ঘেরা, লৌকিকধারায় সেখানকার সব অনুভব ব্যাখ্যা করা যায় না। অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য শংকর, চৈতন্য মহাপ্রভু, ধর্মাবতার ঈশা প্রভৃতি লোকোত্তর মহাপুরুষগণের জন্মের সঙ্গে বহু অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে।

প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীর অলৌকিক দর্শন সময়ে ক্ষুদিরাম গয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁদের কুলদেবতা রঘুবীরের কৃপায় এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন, যার ফল কথা হল, তাঁদের বংশে একজন অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ আসছেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

প্রায় একই সময়ে দুজন সত্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দুটি ভিন্ন জায়গায় একই ধরনের ঘটনা দেখলেন এবং তাঁদের একই ধরনের অনুভব হল, এটা সত্যই আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্ষুদিরামের জীবনের যে-ছবি আমরা পেয়েছি—সদাচার, ত্যাগ, তিতিক্ষা—সব মিলিয়ে দেখলে মিথ্যাভাষণ ত দূরের কথা অতিশয়োক্তির সংস্কারও তাঁর মধ্যে ছিল না। আর চন্দ্রাদেবীর ভাবপ্রবণ স্বচ্ছ জীবনে মিথ্যা কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, জন্মের পূর্ব থেকেই গদাধরের জীবনের যে-আভাস পাওয়া যায় তা লৌকিক ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় না।

যথাসময়ে গদাধর ভূমিষ্ঠ হলেন। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র, বুধ এক সঙ্গে মিশেছে এবং শুক্র, মঙ্গল, শনি তুঙ্গস্থান অধিকার করে তাঁর অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হয়েছে। মহামুনি পরাশরের মতে জাতকের রাহু ও কেতু দুটি গ্রহ তাঁর জন্মকালে তুঙ্গস্থ। তার উপর বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাসী রূপে বর্তমান থাকায় বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ প্রভাব বিস্তার করেছে।

নবজাত বালকের জন্মকুণ্ডলী বিচার করে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদগণের মত হল, জাতক যেরূপ উচ্চ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছে তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে যে, "ঐরূপ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন, এবং নবীন সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়া নারায়ণ অংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভপূর্বক সর্বদা সকল লোকের পূজ্য হইবেন।"[৫]

প্রারব্ধ বা অদৃষ্টের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সহজ জ্ঞানের দিক থেকে এখানে প্রশ্ন—লৌকিক দৃষ্টিতে যে কোন দুটি লোকের আচরণ খুঁটিয়ে দেখলে একজন যে অপর ব্যক্তি থেকে ভিন্ন তা কি আমরা লক্ষ্য করি না? তাহলে সাধারণ লোকের জীবন থেকে গদাধরের জীবনের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? কেনই বা তাঁর জীবনকে আমরা অলৌকিক আখ্যা দিই? উত্তরে বলা যায়, লৌকিক দৃষ্টিতে বা বিচারে যা ধরা যায় না তাকেই আমরা সাধারণ ভাবে অলৌকিক বলি। প্রশ্ন, সাধারণ লোক কি চায়? তারা চায় ধন, মান, যশ, লৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা, বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি। ফলে, রুচি ও পরিবেশভেদে

সাধারণ লোকের যে-কোন ভুজনের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত দিক থেকে অনেকখানি ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ নেই। কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকেই গদাধরের জীবন ও তাঁর মানসিকতা স্বতন্ত্র। তাঁর আচার, ব্যবহার, ভাবনা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সবই যেন সাধারণ থেকে বিপরীত। অতি অল্প বয়সেই গদাধর তাঁর দেবতুল্য পিতাকে হারান। ঐ সময় এক গভীর শূন্যতা যেন তাঁকে পেয়ে বসে। পুর্বোক্ত 'বুধুইমোড়ল', ও 'ভূতির খালের শ্মশান,' বাড়ী থেকে কিছু দূরে মানিক রাজার আমের বাগান প্রভৃতি নানা জনশূন্য স্থানে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেডানো ঐ সময় তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সাধারণত ছেলেদের ভূত-প্রেতের ভয় থাকে, কিন্তু গদাধর বাল্যকাল থেকে অসীম সাহসী ছিলেন, ভয়ের কোন সংস্কার তাঁর মধ্যে ছিল না। বয়স্ক লোকেবা ভূত-প্রেতের ভয়ে যে-সব জায়গায় যেতে সাহসী হতেন না বালক গদাধর স্বচ্ছন্দে সে-সব জায়গায় বিচরণ করতেন। বালক গদাধর তখন থেকেই নির্জনতা-প্রিয় ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। আসল-নকলেব বিচার তখন থেকেই তাঁর জীবনে আরম্ভ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, নিঃসঙ্গপ্রিয়তা অধ্যাত্মজীবনের অঙ্গ।

মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিশেষ এক পরিবেশে, এবং ঐ পরিবেশের প্রভাব তাকে অনেকখানি ঐদিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রভাবিত মানুষ সব সময় নিঃসঙ্গ একাকিত্ব চায়, আপন স্বরূপকে উপলব্ধি করবার জন্য। তাই তারা খুঁজে বেডায় নির্জন স্থান, স্বাভাবিক আবহাওয়া, স্বাজাতিক পরিবেশ ইত্যাদি। অতিক্রান্তির মানসিকতা যেন তাদের সহজাত। সাধারণ জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আকর্ষণ চলেছে। কিন্তু সেখানে প্রবৃত্তির প্রভাব এত বেশী থাকে যাব জন্য নিবৃত্তি কখনও স্থায়ী হয় না। কোনো কোনো সাধকেব মুখে শোনা যায়, জন্ম থেকেই সমগ্র জাগতিক পরিবেশ যেন তাঁর কাছে ছায়াছবির মত মনে হত। ফলে পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে যে নিঃসঙ্গ একাকিত্ব ও নির্জনপ্রিয়তার লক্ষণ দেখা যায় তা তাঁর পরবর্তী কালের পুর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের আভাস।

অতি বাল্যকাল থেকেই গদাধরের মধ্যে একটা সহজাত সূক্ষ্ম শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত শিল্পীমন সুন্দরের উপাসক, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও আনন্দ পরিবেষণ শিল্পীমনের সহজাত বৃত্তি। সৌন্দর্য্যরসিক ব্যক্তি সংহতি ও সমন্বয়ের সাহায্যে এক নতুন মানসলোক সৃষ্টি করেন এবং সেই কল্পলোকে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিহার করেন। কোনো কোনো জীবন-শিল্পীর মধ্যে আবার সৃজনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানীদের মানসিকতায় জিজ্ঞাসা প্রধান, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সেখানে বড কথা নয়। তথ্যনিষ্ঠ বিচার-

বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা নানা জটিল সমস্যার সমাধান করে চলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা একদিকে যেমন সৃষ্টিরহস্যের মূল তত্ত্বের সন্ধান দেয়, বিপরীত মুখে ঐ জিজ্ঞাসাই তাঁদের আত্ম-জিজ্ঞাসার দিকে নিয়ে যায়। কর্মী সব সময়ই বাস্তব কিছু সৃষ্টি করতে চান। 'এষণা' বা প্রযত্নই তাঁদের জীবনে প্রধান। বাল্যাবস্থায় গদাধরের সহজাত শিল্পীমনে এমন এক স্পর্শকাতরতা ছিল যার ফলে সৌন্দর্য্যানুভূতির সূক্ষ্মস্তরে তিনি অবাধে বিচরণ করতে পারতেন। সাত্ত্বিক-মনের লক্ষণ হল স্বচ্ছতা ও লঘুতা। চেতনার রশ্মি অতি সহজেই সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, প্রকৃতি (সত্ত্ব, রজ, তম, তিনগুণের সাম্যাবস্থা) থেকে যেমন পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে, তেমনিও উৎপন্ন হয়েছে প্রকৃতি রাজ্যের সর্বোচ্চ তত্ত্ব সত্ত্বধর্মী বুদ্ধি। স্বচ্ছতার জন্য বুদ্ধিতে সহজেই চেতনার প্রতিবিম্বন হয়। তাই সম্ভবত গদাধরের সহজাত সূক্ষ্ম শিল্পানুভব পরবর্তীকালে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে প্রচলিত ধর্মচেতনায় এমন এক যুগান্তর এনেছিল যার প্রভাব তৎকালে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং আজও যার প্রভাব ভক্তহৃদয়ে সর্বদাই অনুভূত হয়। ঐ সময় অনেকে তাঁর সংস্পর্শে এসে এক নতুন জীবন-দর্শনের সন্ধান পান।

বালক গদাধরের জীবনে শুদ্ধ ভাবপ্রবণতা ও সুকুমার বৃত্তির নিদর্শন মেলে যখন তাঁর বয়স ছয়-সাত। ঐ সময় কখনও কখনও তাঁর দেহবোধ থাকত না। ফলে বালক গদাধর আকাশের মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন ও সুখে দিন কাটাতেন। তাঁর চিত্তের স্বাভাবিক একাগ্রতা বিষয়-বিশেষে যখনই যুক্ত হত, তাঁর দেহবুদ্ধি লোপ পেত। তিনি তখন ভাবসাগরে ডুবে যেতেন। খোলা মাঠে হাওয়ার লুটোপুটি, সবুজের সমারোহ, আপনমনে নদীর অবিরাম ছুটে চলা, পাখীর গান, আকাশের নীল যখনই তিনি দেখতেন তখনই তার রহস্যময় প্রতিকৃতি তাঁর মনের রাজ্যে আপন মহিমা বিস্তার করে তাঁকে আকৃষ্ট করত। বালক গদাধর তখনই তাকে নিয়ে আত্মহারা হয়ে উঠতেন, চলে যেতেন ভাব-রাজ্যের কোন এক নিভৃত প্রদেশে। ঐ সময়ে বালক গদাধরের ধর্মাশ্রিত শিল্পী-মনের পরিচয় দেওয়ার জন্য এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

একদিন তিনি দুধারে ধানের ক্ষেত্রের মধ্যে সরু পথ (আল) ধরে যাবার সময় একদল সাদা বলাকা-শ্রেণীকে মেঘাবৃত কালো আকাশের উপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখেন—"প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নবজলধর ক্রোড়ে বলাকা-শ্রেণীর শ্বেতপক্ষ বিস্তারপূর্বক সুন্দর, স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া বালক গদাধর এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজ

শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ পাইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেই প্রান্তর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন"।৩ শিল্পী মনের সহজাত অনুভব নিয়ে গদাধরের জীবন শুরু। পরবর্তী কালে ঐ অনুভবই জ্ঞান-ভক্তি যোগে অধ্যাত্ম রাজ্যে 'ভাব মুখে থাক' (পরে ব্যাখ্যা দ্রঃ) রূপ নিয়েছিল।

পাঠশালার বাঁধাধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই বালকের পুর্বোক্ত সহজাতবৃত্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি নানা দিকে প্রসারিত হতে লাগল। আঁকার কাজে গদাধর বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অঙ্ক তাঁর ভাল লাগত না। গদাধরের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, অলৌকিক প্রতিভা তাঁকে পাঠশালার অন্যান্য ছাত্র থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। সাধু-সন্তদের জীবনের প্রতি গদাধরের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁদের জীবনধারা গদাধরের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। গ্রামের লোকদের সঙ্গে ঐ সব বিষয় আলোচনা করতে করতে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। এখানে চিন্তনীয়, বালক গদাধরের মানসিকতা কোন অবস্থায়ই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছাড়া অন্য কোন দিকেই আকৃষ্ট হত না। গ্রামের কুমোরদের দেব-দেবীর মূর্তি গড়তে দেখে বালক তাদের কাছে যাওয়া আসা করতে আরম্ভ করলেন। খেলাচ্ছলে কাদামাটি দিয়ে বাড়ীতে মূর্তি গড়া শুরু করলেন। ঐ খেলাটা বালকের খুব প্রিয় ছিল। তাছাড়া পটব্যবসায়ীদের সঙ্গে মেলা মেশা করে তাদের ন্যায় মূর্তিতে রঙ দেওয়া ও আঁকা আরম্ভ করলেন। গ্রামের কোথায়ও পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান হবে শুনলেই গদাধর সেখানে গিয়ে হাজির হতেন, শিখতেন শাস্ত্রোপাখ্যান ও তার ব্যাখ্যা এবং শ্রোতাদের কাছে ঐ সকল বিষয় কি ভাবে প্রকাশ করলে আনন্দদায়ক ও তাদের হৃদয়গ্রাহী হবে তা তিনি অভ্যাস করতে লাগলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী বালক গদাধর অতি সহজেই ঐ-সকল অধিগত ও আয়ত্ত করতে লাগলেন।

এখন প্রশ্ন, বাল্যকালে অনেকের মধ্যে বিষয়বিশেষে লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তা থেকে কি অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে ঐ বালক একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হবেন? আবার কারও কারও মধ্যে বাল্যকালে তেমন কোন প্রতিভার লক্ষণ দেখা যায় না, অতি সাধারণ তাদের আচরণ, কিন্তু পরিণত বয়সে ঐ সব বালকদের মধ্যে কেউ কেউ অসাধারণ হয়েছেন, এমন অনেক নজীর আছে। উভয় শ্রেণীর বালকদের সঙ্গে বালক গদাধরের পার্থক্য কোথায়? এক কথায়, যে-বীজ বাল্যে গদাধররূপ সত্তায় নিহিত ছিল বা যে-সব শুদ্ধ সংস্কার দিয়ে ঐ সত্তা

গঠিত, সেই বীজই কি পরবর্তী কালে সাধক রামকৃষ্ণ ও লোকগুরু শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ রূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল? না, দুইয়ের মধ্যে পরিমাণগত এবং গুণ-ও-পরিমাণগত উভয় দিক থেকে ভেদ ছিল? এক কথায়, রামকৃষ্ণ কি গদাধর-সত্তার অভিব্যক্তি, না উত্তরণ, না উভয়ই? উত্তরে বলা যায়, বালক গদাধর বাল্যকালে যা ছিলেন ভবিষ্যতেও তাই হলেন, পার্থক্য কেবল সাধনার অভিব্যক্তি ও প্রকাশের দিক থেকে।

আরও মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কার্যাবলীর পার্থক্য বিচার করলে দেখা যায় যে, গদাধরের স্বাতন্ত্র্য হল সাধক রামকৃষ্ণ এবং লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস রূপে তাঁর পূর্ণতা প্রাপ্তি, যুগাচার্য্য রূপে যুগান্ধ মানুষদের জ্ঞানের আলো দেখানো, তাদের আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, তাঁর লোকহিতকর কার্য্যকলাপ, বিবেকানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্য দিয়ে নবচেতনার সৃষ্টি ও মানবতা-ভিত্তিক নতুন ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা…ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের বিষয়বিশেষে ভাবপ্রবণতা ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস, জীবন-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কোন যোগসূত্র নেই; কিন্তু গদাধরের বাল্যের ভাবালুতা তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার স্বাভাবিক প্রকাশ, কোনও রূপ হালকা আবেগ বা মানসিক উচ্ছ্বাস নয়।

পূর্বোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আরও বলা যায় যে, সাধারণ ব্যক্তি-বিশেষের স্বরূপ আলোচনায় লক্ষণ-বিচার অপরিহার্য্য হলেও ঐ বিচারে মানুষের আন্তর রহস্য অনেক ক্ষেত্রে ধরা যায় না; আবার আন্তর রহস্য পরিষ্কার ধরতে না পারলে কোন ব্যক্তিসত্তার পূর্ণস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে, বিশেষভাবে লোকোত্তর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, বিষয়টা আরও জটিল হয়ে পড়ে। যে-কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণের পক্ষে কার্য্যকারণ-নিয়ম অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে ঠিক, কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে—যেমন প্রকৃতি-জগতের বিস্ময়কর সৃষ্টি, মানুষ—যার সবকিছু কার্য্যকারণ-নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের মধ্যেও এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা জগতের মধ্যে থেকেও জগতের ঊর্ধ্বে। ব্যতিক্রম যেমন অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম ছাড়া সেই সম্পর্কিত অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতের এমন এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম যা চিরাচরিত ধর্মাচরণ ছাড়াও অধ্যাত্মসাধন রাজ্যের বহু জটিল সমস্যা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ।

পূর্বোক্ত প্রশ্নটি আবার এভাবেও তোলা যেতে পারে: কামার-পুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়-রূপ ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে পরবর্তী কালের সাধক রামকৃষ্ণ কি লুকিয়ে ছিলেন, যার পরিণত রূপ লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-

হংস ? না, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণ দুই পৃথক সত্তা, না, গদাধরের ধ্বংসের মধ্যে সাধক রামকৃষ্ণের আবির্ভাব, না, গদাধর-রামকৃষ্ণ-সম্বন্ধ এক অনির্বচনীয় ব্যাপার ? এ-কথা ঠিক, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তী কালের সাধক রামকৃষ্ণ—উভয়ের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা দেখা যায় তা প্রকাশ ও ব্যাপ্তিব দিক থেকে।

পুর্বোক্ত প্রশ্নটিকে অনুসরণ করে বলা যায়, কামারপুকুরের গদাধররূপ জীবসত্তার অন্তর্নিহিত বীজের অভিব্যক্তি ও কঠোর সাধনা—এই উভয়ে মিলে দক্ষিণেশ্বরের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জনমানসে প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক চেতনায় বিস্তার-লাভই হল লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস রূপে উত্তরণ। অভিব্যক্তি এই অর্থে, প্রারব্ধের যে গৈবিক বীজ কামারপুকুবের গদাধর রূপ জীবসত্তায় অব্যক্ত ছিল, পরবর্তী কালে ঐ বীজই সাধক বামকৃষ্ণরূপে ব্যক্ত হয়েছিল। উত্তরণ, কারণ গদাধবরূপ জীবসত্তাব প্রারব্ধ সিদ্ধসাধক রামকৃষ্ণে অতিক্রান্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, সিদ্ধসাধক লোকগুরু শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ গদাধররূপ জীব-সত্তার জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস, জাতি, আয়ু, ভোগ প্রভৃতি সবই জেনেছিলেন , চেতনাব ক্রমিক ধাবায় অবরোহণ-আরোহণের মধ্যে এ সত্য নিহিত। মনকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়াদিব মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদান সকলকে যুক্তির আলোকে যখন সাজাই তখন আমরা লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করি। এ-অভিজ্ঞতা দেশ-কালগত বা দেশকালিক গণ্ডীতে বদ্ধ। আবার সাত্ত্বিকী বুদ্ধির সহায়ে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে আত্মস্বরূপ মহিমার রাজ্যে প্রবেশ করলে অধ্যাত্ম চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। লৌকিক চেতনা বিষয়-গত, দেশ-কালিক। অধ্যাত্ম চেতনা নির্বিষয়ক। ফলে, সিদ্ধসাধক রামকৃষ্ণ সত্তা দেশ-কালের উর্ধ্বে, কাবণ সিদ্ধ-সাধক রামকৃষ্ণসত্তা আত্মস্বরূপ মহিমার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু গদাধর-চট্টোপাধ্যায়-রূপ জীবসত্তা দেশ-কালের গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন।

গদাধর চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন এমন এক পরিবেশে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) যখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে ইংরেজের অধীন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী স্বভাবচ্যুত, শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বস্তরে বিভ্রান্তি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী ভারতীয় মানসিকতা এক অন্ধ আবর্তে নিমজ্জিত। পশ্চিমী প্রযুক্তিবিজ্ঞান কারিগরী বিদ্যার অগ্রগতি ও তার প্রভাব, যুক্তিপ্রাধান্য, দর্শন-চিন্তায় ভক্তি-বিহীন অজ্ঞেয়ভাবাদ, ভারতীয় সমাজ-জীবন ও শাস্ত্রের প্রতি ঘোর অশ্রদ্ধা তথনকার ইংরেজী শিক্ষিত

ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। ফলে, ভারতীয় চিন্তাজগতে এক জড়বাদী নাস্তিক্য-বুদ্ধির সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমী শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অপরিমেয় মোহ ও আহার, বিহার, আচার, ব্যবহার ও ভাবের আদান-প্রদান—সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ, যা-কিছু ভারতীয় সব খারাপ ও তাকে নস্যাৎ করবার এক উদগ্র বাসনা ভারতীয় তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজকে একপ্রকার আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

বিপরীত মুখে, নানা দিক থেকে ঐ সময়কে আবার যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা যায়। কারণ, দেশের অন্তরে যুগ-সাপেক্ষ সৃজনধর্মী লক্ষণ সকল তখন থেকেই ভারতীয় মনের অবচেতনে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। কালিক দিক থেকে ঐ সময় গদাধরের আবির্ভাব ভারত তথা বিশ্বের পক্ষে বিশেষ অর্থপূর্ণ (তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ)।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলে-ছিলেন, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ছোট জিনিসকে বড় করে দেখবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত এমন এক যন্ত্রবিশেষ যার পাশে যে-কোন বড় জিনিস রাখলে ছোট দেখায়। ঐ একই ভঙ্গিতে রামকৃষ্ণের জীবন ও অধ্যাত্মসাধন সম্পর্কে বলা যায়, অধ্যাত্ম রাজ্যে তাঁর সাধনা এমন এক স্তরে উঠেছিল যার পাশে বসালে পৃথিবীর যে-কোন ধর্মমত অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণের সাধক জীবন (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ) এমন এক বিস্ময়-কর ব্যাপার যা সাধারণ কার্যকারণ-নিয়মের ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় না। শুদ্ধ অনুভবের মধ্যে সে সাধনার আভাস পাওয়া যায়, স্বতস্ফূর্ত আচরণ সে সাধনার প্রকাশের মাপকাঠি।

সতের বছর বয়সে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর জীবনের ষোল বছর কেটেছিল তাঁর জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামে। সেই ষোল বছর সময়ের কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হবে, তাঁর পরবর্তী জীবনের সূত্র ধরবার জন্য।

ছয়-সাত বছর বয়সে শুভ্র বলাকাশ্রেণী দেখে গদাধরের ভাবান্তরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আট বছর বয়সে কামারপুকুরে বিষ্ণু-উপাসক, শিবভক্ত, ধর্মপূজক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের স্থানীয় সাধু-সন্তদের সঙ্গে গদাধরের পরিচয় হয়। তা ছাড়াও গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ-বাসরে স্মৃতির বিধান সম্পর্কিত কোন একটি জটিল সমস্যার তিনি সমাধান করে দেন। জ্ঞান যে মূলতঃ সংস্কার-জাত এবং বিদ্যা যে আহরণ-সাপেক্ষ, গদাধরের জীবনে ঐ সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা গদাধরের বিচার-দক্ষতা দেখে বিস্মিত হন এবং তাঁকে সাধুবাদ জানান। সাধক রামকৃষ্ণের

মতে যে-জ্ঞান হৃদয় ও মনকে বিশুদ্ধ করে একমাত্র তা-ই সত্যজ্ঞান, আর সব কিছুই জ্ঞানের পরিপন্থী।

গদাধরের ভাব-সমাধির কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড়, সেখানে দেবী বিশালাক্ষীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। গদাধর একদিন একদল সঙ্গিনীর সাথে মহানন্দে গান গাইতে গাইতে সেই মন্দিরে দেবী দর্শন করতে যান। এবং দেবী-দর্শনের পূর্বে পথিমধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন। উপায়ান্তর না দেখে সঙ্গিনীগণ দেবী বিশালাক্ষীর নাম স্মরণ করে দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পর গদাধর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বালকের মুখে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। তখন গদাধরকে সঙ্গে করে সকলে মিলে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হলেন এবং যথা-বিধি দেবীর পুজা দিয়ে গৃহে ফিরলেন। গদাধরদের পারিবারিক বন্ধু ধর্মদাস লাহার কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

আরও দুই-একটা ঘটনার কথা এখানে বলা হল গদাধরের পুর্বোক্ত শিল্পী-মানসের পরিচয় দেওয়ার জন্য।

একবার তিনি গৌরহাটি গ্রামে তাঁর ছোট বোন সর্বমঙ্গলাকে দেখতে যান এবং বোনের বাড়ী প্রবেশ করেই দেখলেন তাঁর বোন সর্বমঙ্গলা প্রসন্ন-মুখে তাঁর স্বামীর সেবা করছে। বাড়ী ফিরে এসে অল্পদিনের মধ্যে তিনি ঐ আদলের একখানা ছবি আঁকেন। ছবিখানি এত হৃদয়গ্রাহী ও নিখুঁত হয়েছিল যে, গদাধরের পরিচিত সকলেই ঐ ছবিখানি দেখে মুগ্ধ হন।

প্রচলিত রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ছাড়াও, কামারপুকুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেব-দেবীদের কথা, যেমন 'যোগাদ্যার পালা', 'বন বিষ্ণুপুরের ৺মদন-মোহনজীর উপাখ্যান,' '৺তারকেশ্বরের মহাদেবের প্রকট হওয়ার কথা' ইত্যাদি গ্রাম্য কবিরা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, এবং ঐ সব উপাখ্যান ঐ সকল অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। গদাধর ঐ সকল উপাখ্যান শুনে মুখস্থ করে ফেলেন, এবং কখনও কখনও গ্রামের সরলভাবের নর-নারীদের কাছে সুললিত কণ্ঠে ঐ সকল বিষয় আবৃত্তি করতেন।

গদাধরের অভিনয়-কুশলতা দেখে তাঁর সঙ্গিগণ তাঁকে একটা যাত্রার দল খোলবার জন্য ধরলেন। বন্ধুদের প্রস্তাবে গদাধর সম্মত হলেন। 'রিহার্সালের' স্থান ঠিক হল পুর্বোক্ত মানিক রাজার আমের বাগান। পাঠশালা থেকে পালিয়ে ছেলেরা সেখানে উপস্থিত হত এবং গদাধরের কৃতিত্বে 'শ্রীরামচন্দ্র' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'-বিষয়ক অভিনয়ে আম্রকানন মুখরিত হয়ে

থাকত। ঐ অভিনয়ের সময়েও কখনও কখনও গদাধরের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিত।

এখানে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা হবে যা ঐ অঞ্চলের অনেকের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করে শিব-ভক্তি ও বিষ্ণু-ভক্তি দীর্ঘদিন কামারপুকুরে পাশাপাশি চলে এসেছে। পাইনরা কামারপুকুরের বিশেষ ধনী পরিবার। একবার শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষে পাইনদের বাড়ীতে পাশের গ্রামের যাত্রা দলের শিবের মহিমাসূচক পালা গাইবার কথা। কিন্তু যিনি শিবের অভিনয় করবেন ঠিক ছিল হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে, যাত্রাভিনয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। তখন সকলে ঠিক করল গদাধরকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করবার জন্য। কারণ, গদাধরের বয়স অল্প হলেও সে শিবের অনেক গান জানে, এবং শিব সাজলে তাঁকে ভাল মানাবে। গ্রামের সকলের আগ্রহ দেখে গদাধর তাদের কথায় সায় দিলেন। অভিনয় আরম্ভ হল। শিব সেজে গদাধর শিবের মহিমার কথা ভাবতে লাগলেন। যথাসময়ে গদাধরের ডাক পড়ল। গদাধরকে হাত ধরে তোলা হল। কোন দিকে লক্ষ্য না করে উন্মনা ভাবে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে শিবসাজে সজ্জিত গদাধর সভাস্থলে হাজির হলেন। জটাজুট-ধারী বিভূতি-মণ্ডিত বেশ; শান্ত সমাহিত ভাব, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি—সে এক অপূর্ব দৃশ্য, —গদাধরের সৌম্য মূর্তি দেখে শ্রোতৃমণ্ডলী হরিধ্বনি করে উঠল, মেয়েরা উলু দিতে লাগল, চতুর্দিক শঙ্খ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই হর্ষে মুখরিত, বিস্ময়ে অভিভূত। নিবাত, নিষ্পন্দ গদাধরকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দলের অধিকারীর মনে সন্দেহ হল। গ্রামের দুই-এক জন বৃদ্ধ ব্যক্তি বালকের কাছে গিয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর হাত, পা অসাড়, বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য। বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা ফিরছে না দেখে যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হল, এবং কয়েকজন লোক গদাধরকে কাঁধে নিয়ে তাঁর বাড়ী পৌঁছে দিল। বহু সেবা-যত্নেও বালকের আর সে ভাব কাটে না, বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। পরের দিন সূর্যোদয় হলে সে ভাব কেটে যায়। কেউ কেউ বলেন, তিন দিন গদাধর ঐ অবস্থায় ছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, কোন দেব-দেবী বা ধর্ম বিষয়ক আলোচনায়, এমন কি অভিনয়ের সময়েও গদাধরের ঐরূপ ভাবান্তরে হত। কারণ, সম্ভবত গদাধরের মানসিক গঠনের মধ্যে এমন সব সাত্ত্বিক উপাদান ছিল যার সঙ্গে যে-কোন উচ্চভাবের সাযুজ্য স্বাভাবিক। অতএব, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জন্ম থেকেই গদাধরের মন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল।

আট বছর বয়সে গদাধর লাহাবাবুদের পান্থশালায় জনকয়েক সাধুর সঙ্গে মিলিত হন। কামারপুকুরের অগ্নিকোণে পুরী যাওয়ার পথ, সেই পথের ধারে লাহাবাবুদের পান্থশালা। সাধু-বৈরাগীরা শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে ঐ পান্থশালায় বিশ্রাম নিতেন। সেখানেই সাধু-বৈরাগীদের সঙ্গে গদাধরের পরিচয়। সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি গদাধরের সহজাত আকর্ষণ সাধু-সঙ্গে উজ্জীবিত হল। সংসারের অনিত্যতা তিনি পূর্বেই কিছুটা উপলব্ধি করেছেন। এখন সে উপলব্ধি আরও দৃঢ় হল।

নয় বছর বয়সে গদাধরের উপনয়ন হয়। ঐ সময় একটা ঘটনা ঘটে যা তাঁর ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক জীবনে জাতিবিচার হিন্দু সমাজের প্রধান অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত। গদাধরের বাল্যাবস্থায়, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৩০-৩৫ বৎসর পুর্বে, জাতিভেদের ব্যাপার সমাজ-জীবনে খুব কঠোর ছিল। ঐ সময় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি হল, গদাধরের জন্ম থেকেই ধনী নামে একজন কামারের মেয়ে গদাধরকে নিজের ছেলের মত দেখাশুনা করতেন। ধনীর মনে আশা ছিল, গধাধরের উপনয়নের সময় তিনিই তাঁর 'ভিক্ষা-মা' হবেন। গদাধর তাঁকে ঐ রকম কথাও দিয়েছিলেন। উপনয়নের সময় গদাধর তাঁকে 'মা'-বলে ডাকবে, এই আনন্দে গদাধরের উপনয়ন উপলক্ষে 'ভিক্ষা-মা'র কৃত্য সব উপকরণ ধনী যথাসাধ্য যোগাড় করে রেখেছিল। আমরা পুর্বেই বলেছি, গদাধরের জন্ম হয়েছিল এক সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। ব্রাহ্মণেতর জাতের কোন স্ত্রীলোক উপনয়ন-সময়ে তাঁদের বংশের কারও 'ভিক্ষা-মা' হয়েছে এমন কোন নজির তাঁদের পারিবারিক ইতিহাসে নেই। ফলে, গদাধরের বড় ভাই শাস্ত্রজ্ঞ রাম-কুমার চট্টোপাধ্যায়—পিতার মৃত্যুর পর যার উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল—কর্মকারের মেয়ে ধনীকে উপনয়ন কালে গদাধরের 'ভিক্ষা-মা' গ্রহণের পক্ষে আপত্তি তুললেন। কিন্তু গদাধর নিজে এ-ব্যাপারে বেঁকে বসলেন, তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের কথায় সায় দিলেন না। গদাধর বললেন, উপনয়নকালে ধনী কামারিণীকে 'ভিক্ষা-মা' বলে গ্রহণ না করলে এবং মা বলে না ডাকলে তাঁর সত্যভঙ্গের অপরাধ হবে এবং কোন মিথ্যুক ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারী হতে পারে না। ফলে, গদাধরের উপনয়ন-যজ্ঞ পণ্ড হতে চলল। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ নিয়ে বাদানুবাদের পর রামকুমারদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ধর্মদাস লাহা গদাধরের পক্ষ সমর্থন করেন এবং উপনয়ন-কালে ধনী কামারিণীকে 'ভিক্ষা-মা' গ্রহণের পক্ষে মত দেন। ফলে, গদাধরের উপনয়ন যথাবিধি সম্পন্ন হল এবং ধনী কামারিণী গদাধরের ভিক্ষা-মা হলেন।

এক সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের দীর্ঘদিনের কুলপ্রথা ভেঙ্গে গেল,

সত্যের জয় হল। এখানে স্মর্তব্য, যে-পরিবারে স্বয়ং রামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন, যিনি সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধর্মজগতে এক নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সেই পরিবারে এ-ঘটনা সত্যই বিস্ময়কর। আবার গদাধরের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এ ঘটনার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই। গদাধরের ধর্মাচরণে এটাই স্বাভাবিক। সত্যের কাছে কোন পারিবারিক কুলপ্রথা বড় হতে পারে না।

এই ঘটনাটি গদাধরের বাল্যজীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ, গদাধর ভারতের প্রচলিত ধারায় ধর্মাচরণ করেন নি। একদিকে তিনি যেমন চাল-কলা-বাঁধা পুরোহিততন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অপরদিকে আচার-সর্বস্ব চিরাচরিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। মুনি-ঋষিদের অভিপ্রেত নীতিচালিত অধ্যাত্ম ভারতের ধর্ম-অবক্ষয়ের দিনে পুরোহিত-তন্ত্রের আধিপত্য। সে পুরোহিত-তন্ত্র যে বর্তমান সমাজ-চেতনায় নতুন কিছু দিয়ে সমাজকে উজ্জীবিত করতে পারবে না, এ কথা গদাধর সেদিন বুঝেছিলেন। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ গদাধরের জীবন ছিল জন্ম থেকেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী কালে জীবন পণ করে তিনি আবিষ্কার করলেন বর্ত্তমান যুগোপযোগী অমৃত-তত্ত্বের পথ, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তিনি তার রসাস্বাদন করলেন, সাধনার মূল সূত্র তিনি ব্যক্ত করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর একান্ত ভক্ত ও প্রকৃত জিজ্ঞাসুদের কাছে। তাই মনে হয়, গদাধরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রামকৃষ্ণরূপে ধর্ম-জগতে যুগান্তর আনা।

উপনয়নের পর থেকে গদাধর নিয়মিত ধর্ম-কর্ম আরম্ভ করলেন। তাঁর উপর ভার পড়ল, তাঁদের কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পুজা, সঙ্গে যুক্ত হল গৃহে প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিব ও মা শীতলার সেবা। মনের মত কাজ পেয়ে গদাধরের ভাবপ্রবণ স্বচ্ছ হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। গভীর অনুরাগ ও ভক্তির সঙ্গে তিনি কুলদেবতার পুজা আরম্ভ করলেন। ঐ সময় প্রায়ই তাঁর ভাব-সমাধি হত। ক্রমে তিনি ঐ অবস্থায় অভ্যস্ত হন, এবং ব্যাপারটি তাঁর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়ায়। তা-ছাড়াও নানাবিধ দিব্যদর্শন তাঁর পুজা-অর্চনার অঙ্গ হল, এবং অধ্যাত্ম রাজ্যে নানা অভিজ্ঞতার পথ প্রশস্ত করল। দেব-দেবী সম্পর্কে নানা তত্ত্ব তিনি ঐ সময় উপলব্ধি করেন, এবং ধর্ম-জগতের অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হতে লাগল। ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি যোগের উচ্চতর স্তর-সকলের সঙ্গে তিনি ঐ সময় সাক্ষাৎ পরিচিত হতে থাকেন। গদাধর যে লোকোত্তর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর বাল্যজীবনের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে পাওয়া যায়।

গদাধরের ভাবান্তরের কথা বলা হল। প্রসঙ্গত এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, ঐ ভাবান্তর কি যোগ-সমাধির অন্তর্ভুক্ত না অন্য কিছু? পাতঞ্জলের যোগসূত্রে প্রধানভাবে দুই প্রকার সমাধির কথা বলা হয়েছে, (১) সম্প্রজ্ঞাত, (২) অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবার ছয়টি স্তর, (১) সবিতর্ক, (২) নির্বিতর্ক, (৩) সবিচার, (৪) নির্বিচার, (৫) সানন্দ, (৬) সাস্মিত। যোগের মূল লক্ষ্য হল যুক্ত হওয়া, আত্মোপলব্ধি বা প্রজ্ঞা-দর্শন। আকাশ-পথে বলাকাশ্রেণী দেখে বা আনুড়ে বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে যাওয়ার পথে এবং কুলদেবতাদের পূজার সময় গদাধরের মধ্যে যে গভীর তন্ময়তা বা ভাবান্তর দেখা যেত তা পূর্বোক্ত সমাধিস্তর সকলের কোন্ স্তর? ক্ষিপ্ত, মূঢ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরোধ—চিত্তের এই পাঁচটি ভূমির আলোচনায় দেখা যায়, একাগ্রভূমি থেকে সত্যিকারের যোগ-সমাধি আরম্ভ হয়, এবং ঐ সময় গদাধরের চিত্ত যে একাগ্রভূমিতে (অর্থাৎ, সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কিত কোন প্রতীকের সাথে স্বাভাবিকভাবে একাত্ম হওয়া) স্থিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতি বাল্যাবস্থায় (গদাধরের বয়স যখন ছয়-সাত) গদাধরের যে-ভাবসমাধি হতো ঐ সমাধি সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির সানন্দ স্তরের বলা যায়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, সামান্য হৃদয়াবেগ উঁচুতে ওঠার ফলে যদি আমাদের দৃষ্টি স্তিমিত হয়, অঙ্গ শিথিল হয়, ইন্দ্রিয়াদি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়, প্রাণস্পন্দ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়, তখনই আমাদের সমাধিলাভ হয়েছে। কিন্তু পাতঞ্জলের যোগসূত্র আলোচনা করলে দেখা যায় সমাধি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়, ফলে, যে-সমাধিতে প্রজ্ঞার উদয় হয় না, বা যে-ভাব মনকে আত্মোপলব্ধির দিকে আকৃষ্ট করে না তা সমাধি নয়, একপ্রকার ব্যাধি বা মূর্চ্ছা। গদাধরের বাল্যাবস্থায় যে তন্ময়তা বা একাগ্রতা দেখা যেত তা কোন হালকা মানসিক ভাবাবেগ নয়, প্রজ্ঞার প্রকাশ, তা না হলে তাঁর দৃষ্টি অত সুদূর-প্রসারী হতো না।

পাঠশালা ত্যাগ করে গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় নানা দেব-দেবীর মূর্তি গড়তেন, এবং কখনও কখনও সঙ্গীদের নিয়ে মহাসমারোহে ঐ সকল দেব-দেবীর পূজা করতেন। তা-ছাড়াও সাংসারিক কাজে তিনি তাঁর মা চন্দ্রাদেবীকে সাহায্য করতেন।

সত্যনিষ্ঠা, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, সদাচার ও ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী বাল্যাবস্থায় গদাধর তাঁর পিতার কার্যাবলীর মধ্যে দেখেছিলেন। ঐ গুণগুলি সামনে রেখে তিনি অপরের আচরণের মূল্য ও মান ঠিক

করতেন। ঐ বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন, অনিত্য সংসারকে নিত্য মনে করে আঁকড়ে ধরে মানুষ কত না দুঃখকষ্ট ভোগ করে। গদাধরের সরল, সপ্রেম, অমায়িক ব্যবহারে কামারপুকুর অঞ্চলের স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বহু লোক তাঁকে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ মনে করত এবং সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। গদাধরের সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁকে ঐ বয়সেই মানুষ চিনতে সাহায্য করেছিল, এবং যারা তাঁর সংস্পর্শে যেত তিনি তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণামের কথা বুঝতে পারতেন।

চোদ্দ বছর বয়সে গদাধরের মধ্যে ভক্তি ও ভাবালুতা এমন তীব্র হয়ে উঠল যে, তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন, পাঠশালার অর্থকরী বিদ্যা নিরর্থক, সময়ের অপব্যবহার। তিনি আরও বুঝেছিলেন, তাঁর জীবন অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সৎজীবনের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। ঐ সময় তিনি নিগূঢ় ধর্মতত্ত্বের অতুলনীয় ব্যাখ্যা করতেন এবং বলতেন নিজের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ সে তো স্বার্থপরতা বৈ কিছু নয়। এমন কিছু সংসারে করতে হবে বা রেখে যেতে হবে যাতে অপরের মঙ্গল হয়। পরবর্তীকালে তাঁর প্রিয় সন্ন্যাসী-শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি ঐ একই কথা অন্যভাবে বলেছিলেন। নির্বিকল্প-সমাধি ও আত্মমুক্তির পথ ত্যাগ করে নরেন্দ্রনাথকে তিনি বটবৃক্ষের মত হতে বললেন, কারণ বটবৃক্ষের নীচে বহু তাপিত লোক আশ্রয় নিতে পারে।

পুর্বোক্ত আলোচনার ধারা অনুসরণ করে গদাধর সম্পর্কে এ-কথা সহজেই বলা যায় যে, নিম্নোক্ত বিষয় সকল গদাধরের বাল্যজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল : গদাধরের বংশানুক্রমিক ধারা (বিশেষভাবে পিতার আচরণ), গ্রাম-বাংলার জল, বায়ু, মাটি (যার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন অবকাশ নেই) রাঢ় ভূমির তন্ত্রোক্ত শক্তি-ভক্তি-সাধন-পরম্পরা, সত্যনিষ্ঠ মানসিকতা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, ঈশ্বর-অনুগ্রহ এবং সর্বোপরি গদাধরের অন্তর্নিহিত শুদ্ধ-সংস্কার-জাত গৈরিক বীজ।

ভবিষ্যতে গদাধরের জীবন[৭] কি ভাবে চলবে, এ-কথা যখনই তাঁর মনে হতো তখনই তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠত গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন, ও নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি।

বিনা বিচারে বিধিনিষেধ মেনে চলা গদাধরের মানসিকতায় ছিল না, হৃদয়স্পর্শী কথা না বললে, বিধি ও নিষেধ যাই হোক না কেন বালক গদাধর তার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাক, সর্বদা তার বিপরীত আচরণ করতেন। যখনই বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিত, তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয় সব সময় জয়লাভ করত। হৃদয়ের প্রেরণাতে তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করতেন।

সতের বছর বয়সে গদাধরের সাধন-কাল পরিপক্ক হল। তাঁর চিত্তভূমি তখন সাধন-ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত। হৃদয়স্থিত হৃষীকেশের প্রেরণায় তিনি সর্বাত্মক সাধনার পথে পা বাড়ালেন। কলকাতার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বরে (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ) তাঁর সাধনার বেদী প্রস্তুতির পথে। আসন গ্রহণের পক্ষে গদাধরের মানসিক প্রস্তুতির পর্ব শেষ। কামারপুকুরের লীলা-খেলা সাঙ্গ করে গদাধর কলকাতায় এলেন।

রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা

সাধক রামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বর



শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস

দ্বিতীয় অধ্যায়

কামারপুকুরের বাল্যলীলা শেষ করে গদাধর কলকাতায় এলেন, তখন তাঁর বয়স সতের। বাইরের দিক থেকে গদাধরের কলকাতায় আসবার প্রধান কারণ হল, তাঁর বড় ভাই শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার মনে করলেন শাস্ত্র-অধ্যয়ন গদাধরের পক্ষে অবশ্যকৃত্য। তাছাড়া, দেশ-ঘরে থেকে সাংসারিক দিক থেকে সে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। তাই শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও দেব-সেবার অজুহাতে গদাধরের কলকাতায় আগমন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে গদাধরের কলকাতায় আসার পেছনে মা জগদম্বার ইচ্ছা ছিল প্রধান। তাঁর পরবর্তী জীবন তারই সাক্ষ্য দেয়। ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর কাছে রামকুমারের চতুষ্পাঠী। স্মৃতিশাস্ত্র ও জ্যোতিষ সেখানে নিয়মিত পড়ান হতো। চতুষ্পাঠীর ছোটখাট কাজ সেরে, আশে-পাশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেব-সেবা করতেন গদাধর। ঝামাপুকুর অঞ্চলের পুরোণো বাড়ীর মেয়েরা গদাধরের পুজা-অর্চনা, মধুর ব্যবহার ও ভজন-গান শুনে মুগ্ধ হতেন। ফলে কামারপুকুরের ন্যায় ঝামাপুকুরেও গদাধর পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। শাস্ত্র-পাঠের প্রতি গদাধরের আগ্রহের অভাব দেখে জ্যেষ্ঠ রামকুমার একদিন তাঁকে মৃদু ভৎর্সনা করলেন। সরলপ্রাণ গদাধর সহজভাবে সেদিন তাঁর মনের কথা বলে ফেললেন। গদাধরের বক্তব্য হল, অর্থকরী বিদ্যার প্রতি তাঁর সামান্যতম মোহ নেই। দুদিনের ভোগ-লালসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য সংসারী লোকদের আজীবন কঠোর পরিশ্রম যে কত তুচ্ছ ব্যাপার সে বিষয় অতি অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন। রামকুমারকে সেদিন তিনি ঐ কথাই অন্য ভাষায় বলেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার সম্ভবত সেদিন সরলহৃদয় গদাধরের মনের ভাব ঠিক ধরতে পারেন-নি।

রামকুমার ও রামকৃষ্ণ উভয়ের কলকাতার জীবনে একটা বড় পরিবর্তন দেখা দিল। কলকাতার জানবাজারে রানী রাসমণির বাস। রানী রাসমণি একজন তেজস্বিনী, ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। বাংলা ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণির সঙ্কল্প অনুযায়ী গঙ্গার পুর্বকুলে দক্ষিণেশ্বরে[৮] শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি রাজ্যের পণ্ডিতপ্রধান অঞ্চল থেকে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন এবং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাস্ত্রজ্ঞ দেবীভক্ত রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। শোনা যায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তখনকার দিনে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের একান্ত অনুরোধে রামকুমার কালিকা-দেবীর পূজক পদে নিযুক্ত হন।

সেদিনের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ও আনন্দোৎসবে গদাধর প্রাণ খুলে যোগ দেন। কিন্তু খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে তাঁর বাদ-বিচার থাকায় তিনি সেদিন সেখানে কিছু খাননি। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পায়ে হেঁটে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে যান। পরদিন ভোর বেলায় গদাধর আবার দক্ষিণেশ্বর গিয়ে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং যথারীতি আবার ঝামাপুকুরে ফিরে এসে আহারাদি করেন।

ঐ সময় গদাধরের মনে একটা বড় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে তাঁর পিতার আদর্শ—অশূদ্রযাজিত্ব ও অপ্রতিগ্রাহিত্ব (শূদ্রের বাড়ীতে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, গদাধরের পিতা, কখনও পূজা-অর্চনা করতেন না, বা তাঁর কোন শূদ্র যজমান ছিল না, এবং তিনি শূদ্রের কোন দান গ্রহণ করতেন না)। অন্যদিকে শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁর অগ্রজ রামকুমারের পূজকের পদ গ্রহণ, পিতা ও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ের আচরণের অসঙ্গতি তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। দুই এক দিন গভীরভাবে চিন্তার পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন এবং তাঁর অগ্রজকে তাঁর পিতার আচরণ স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজকের পদ ত্যাগ করতে বললেন। রামকুমার তার এ পদ গ্রহণের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় অনুশাসন, বিধি-নিষেধ ও আরও অনেক যুক্তি দেখিয়ে রামকৃষ্ণকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের মন রামকুমারের ঐ সকল কথায় সায় দিল না। অবশেষে ঐ সম্পর্কে 'ধর্মপত্রে' প্রকাশিত একটি মন্তব্য দেখে রামকৃষ্ণ কিছুটা শান্ত হলেন। মন্তব্যটি হল, 'রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই।' রামকৃষ্ণ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং সেখানে থেকে গেলেন। কিন্তু সমস্যা হল তাঁর আহারাদি নিয়ে। সাধারণভাবে খাওয়া তো দূরের কথা, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রসাদ খেতেও তিনি রাজী হলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখে রামকুমার গদাধরকে সিদা নিয়ে গঙ্গাতীরে স্বপাকে ভোজন করতে বললেন। গঙ্গাদেবীর প্রতি রামকৃষ্ণের সহজাত ভক্তি তাঁর আহার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ অনেকখানি শিথিল করল। গঙ্গাতীরে স্বপাকে আহার করে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

এখানে প্রশ্ন, আহার সম্পর্কে রামকৃষ্ণের অত্যধিক বাদ-বিচার তাঁর অনুদার মনের পরিচায়ক নয় কি ?

উত্তরে বলা যায়, 'না'। কারণ, অনুদারতা আসে অহঙ্কার থেকে, শৈশব থেকেই রামকৃষ্ণের মনে অহঙ্কার বলে কোন পদার্থ ছিল না, আর নৈষ্ঠিক আচরণ হল আত্মগত ব্যাপার। নিষ্ঠার মূলে আছে শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের অনুশাসনের প্রতি বিশ্বাস। অতএব, নিষ্ঠা যত বাড়তে থাকে অনুদারতা ততই কমতে থাকে এবং পরিণামে অহংকার দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুদারতা লোপ পায়। শাস্ত্রের নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা রেখে আমরা যতই অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল অনুশীলন করতে সমর্থ হই, ততই আমরা উদারতার পথে যাই এবং পরিণামে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শান্তিলাভ করতে সক্ষম হই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজেই বলতেন, নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে সত্যের উদারতায় পৌছিতে হয়। শাসন, নিয়ম প্রভৃতি অনুসরণ করেই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করতে হয়।

রামকৃষ্ণ সব সময়ই নিজের আচরণ সম্পর্কে সজাগ থাকতেন এবং সত্যের অন্বেষণ করতেন। প্রসঙ্গত এখানে ধনী কামারিণীকে 'ভিক্ষা মা' গ্রহণের ব্যাপারটি স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে রামকৃষ্ণ কোন জাতবিচার মানেন নি, বংশের চিরাচরিত ধারা থেকে বিচ্যুত হতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। কারণ, ধনী কামারিণীর মনের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও আবেগ সত্য-প্রতিষ্ঠ রামকৃষ্ণ অস্বীকার করতে পারেন না।

রামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির-প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে রামকৃষ্ণের ভক্তি, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু (ঐ সময় যিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কর্মকর্তা ছিলেন) রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, রামকৃষ্ণের বাইরের আচরণ ছিল শিশুর মত। সেই শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য মা জগদম্বা স্বয়ং যেন মথুরবাবুকে পাঠিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের ব্যবহারিক জীবনে মথুরবাবুর অবদান অবিস্মরণীয়। গুরুজ্ঞানে রামকৃষ্ণের সব আবদার মথুরবাবু যথাসাধ্য আজীবন পালন করে গেছেন।

আহার, বিহার, সংসারের সর্ববিষয়ে উদাসীন, নিঃস্বার্থ, ভাবুক রামকৃষ্ণের জীবনে আর একজন শ্রদ্ধাশীল, সাহসী, উদ্যমী মানুষের প্রয়োজন ছিল। সে-অভাব পূর্ণ হল ঠাকুরের নিজের ভাগিনেয় হৃদয়রামের সেবার মধ্য দিয়ে। তিনিও ঠিক ঐ সময়ে কাজের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হন। রামকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়রাম এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ বোধ করতেন

এবং সর্বদা ছায়ার মত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। কোন প্রকার ভারী কাজের দায়িত্ব না নিয়ে স্বচ্ছন্দ চিত্তে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দিন কাটতে লাগল। কামারপুকুরের প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে তাঁর কমে যেতে লাগল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রতিটি জীবের উপর আছে। কিন্তু ঈশ্বর-আদিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনে দেখা যায়, তাঁদের যখন যে-ধরনের লোকের প্রয়োজন হয় ঈশ্বর ঠিক সেই ধরনের লোক তাঁদের তত্ত্বাবধানে পাঠান। রামকৃষ্ণের ন্যায় আপনভোলা শিশুর জীবনে মথুরবাবু, হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে শম্ভুচন্দ্র মল্লিক, বলরাম বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণের আগমন আকস্মিক ঘটনা নয়, অনিবার্য ব্যাপার।

একমাত্র পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা ছাড়া অন্য যে-কোন কাজের প্রতি রামকৃষ্ণের প্রবল অনীহা ছিল। মথুরবাবু তাঁকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতে পারেন এই আশঙ্কায় রামকৃষ্ণ যথাসম্ভব মথুরবাবুকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু যথাসময়ে যা ঘটবার তাই ঘটল। একদিন মথুরবাবু কালী-মন্দির দেখাশুনা করতে এসে রামকৃষ্ণকে ডাকিয়ে দেবীর বেশকারীর পদ গ্রহণ করতে বললেন এবং সেই সঙ্গে হৃদয়রামকে তাঁদের সহকারীর পদে নিয়োগ করলেন। হৃদয়রামকে সহকারীর পদে পেয়ে রামকৃষ্ণ ঐ দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে ঐ সকল ঘটনা ঘটল।

ঐ সময়ের একটা ঘটনা রামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম বিচার-বোধের পরিচয় দেয় এবং তা-থেকে আমরা তাঁর সাধক জীবনের একটা নতুন দিকের আভাস পাই। ঘটনাটি ঘটে বাংলা ১২৬২ সালের ভাদ্র মাসে। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখন দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের পূজক। জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব। রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগ শেষ করে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দজীকে শুইয়ে দিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান এবং বিগ্রহের একটি পা ভেঙ্গে যায়। এ-বিষয়ে নানা পণ্ডিতের বিধান নেওয়া হল, ভগ্ন বিগ্রহ বিসর্জন, নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা সকলেই এক বাক্যে বললেন, কারণ ভগ্ন বিগ্রহে দেবতার পূজা সিদ্ধ নয়। রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ঐ ব্যাপারে ভিন্ন মত দিলেন। সযত্নে তিনি বিগ্রহটির ভগ্ন পা সুন্দর করে মেরামত করলেন এবং ঐ বিগ্রহটিকেই পূজার নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্যান্য পণ্ডিত থেকে রামকৃষ্ণ সেখানে ভিন্ন মত দিলেন কেন? আমরা পূর্বেই বলেছি, বিচার না করে রামকৃষ্ণ কখনও বাঁধাধরা পথে চলতেন না। বরানগরের জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামকৃষ্ণ এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। বরানগরের কুটিঘাটার কাছে

রতনবাবুর ঘাট, সেখানে দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। রামকৃষ্ণ একদিন সেখানে মন্দির দেখতে যান। দক্ষিণেশ্বরের ভাঙ্গা গোবিন্দজীর পূজা সম্পর্কে জয়নারায়ণ বাবু কথা তুললেন। রামকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার তিনি কি কখনও ভগ্ন হতে পারেন? তা-ছাড়াও দেব-দেবীর সঙ্গে আমাদের আত্যন্তিক যোগসূত্র, যেমন বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি নানা-ভাবে আমরা দেব-দেবীর ভজনা করি। আমাদের আত্মীয়দের কারও যদি অঙ্গহানি হয় তাকে কি মৃত জ্ঞানে আমরা ফেলে দিই? নিশ্চয়ই না। তবে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সম্পর্কে অন্য ব্যবস্থা হবে কেন? রানী রাসমণিকেও তিনি ঐ ধরনের জবাব দেন। রামকৃষ্ণের মতে ব্যবহারিক জগৎ হল আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতিবিম্ব, তাই তিনি ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক সময় সত্য যাচাই করে নিতেন। এরপর রামকৃষ্ণকে ভগ্ন বিগ্রহ সম্পর্কে কেউ আর কোন প্রশ্ন করেনি। অনবধানতার অপরাধে পূজক ক্ষেত্রনাথের কাজ গেল। রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার পড়ল রামকৃষ্ণের উপর।

রামকৃষ্ণের পূজা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার, দেখবার মত দৃশ্য। আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, প্রভৃতি সম্পন্ন করবার সময় ঐ মন্ত্র-সকলের ছাপ তিনি নিজের দেহে দেখতে পেতেন। পূজার আসনে বসে পূজক রামকৃষ্ণ দেখতে পেতেন সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি[৯] নিজ দেহ-অভ্যন্তরে সুষুম্নার পথ ধরে সহস্রার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং দেহের যে-যে অংশ ঐ শক্তি ত্যাগ করে চলেছে, দেহের সেই সেই অংশ অসাড় ও মৃতবৎ হয়ে যাচ্ছে। আবার, 'রং-ইতি জলধারয়া বহ্নি প্রকারাণ বিচিন্তা।' পূজার বিধি অনুসারে 'রং' মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে জল ছিটিয়ে ভাবতে হয়, অগ্নির প্রাচীরে পূজাস্থল বেষ্টিত হোক, এবং কোন বাধাবিঘ্ন যেন সেখানে প্রবেশ না করে। 'রং'-মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করতেন অগ্নির লেলিহান শিখা সেখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পূজামণ্ডপকে সব রকমের বিঘ্ন থেকে রক্ষা করছে। পূজার সময় রামকৃষ্ণের তেজোদীপ্ত চেহারা দেখে দর্শকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ্য দেব যেন নরশরীরে পূজায় বসেছেন।

পূজা-অর্চনার ব্যাপারে উৎসাহ ছাড়া রামকৃষ্ণের মধ্যে ঐ সময় একটা নিঃসঙ্গ উদাসীন ভাব রামকুমার লক্ষ্য করলেন। ক্ষুরধার সর্পিল পথ ধরে অধ্যাত্ম-সাধকদের চলতে হয়, তাঁদের জীবনে ভাবান্তর অস্বাভাবিক কিছু নয়। কখনও কখনও গঙ্গাতীরে ঐ সময় রামকৃষ্ণকে একাকী ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, মন্দিরের নিকটে পঞ্চবটীর তলায় কখনও তিনি একা বসে থাকতেন। আবার কখনও কখনও পঞ্চবটীর চারদিকে যে জঙ্গল তার

ভিতর প্রবেশ করতেন এবং বহুক্ষণ পরে ফিরে আসতেন। তাঁর ঐ অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য কেন? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার তাঁর কাছে প্রশ্ন করে কোন জবাব পাননি। সংসারে বাস করেও সাধকরা সংসারের মধ্যে থাকেন না অর্থাৎ পার্থিব কোন কিছুই তাঁদের মনে দাগ কাটে না। কোন কিছুর সম্যক জ্ঞানের পক্ষে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি সংসার-বিরক্তির পক্ষে প্রয়োজন সংসারকে ভাল করে বোঝা। আর এই বোঝার পক্ষে প্রয়োজন সংসারে থেকেও সংসারের উর্ধ্বে মনকে স্থির রাখা। রামকৃষ্ণের এই ঔদাসীন্য বিবাগী মনের লক্ষণ, বৈরাগ্যের আভাস।

অন্যদিকে মথুরবাবুর অনুরোধে প্রথমে দেবীর বেশকারীর পদ, পরে রাধাগোবিন্দজীর পূজকের পদ গ্রহণ, সব কাজই রামকৃষ্ণ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেন। ফলে, কাজের দিক থেকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণকে চণ্ডীপাঠ, মা ভবতারিণী ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা শেখাতে লাগলেন। শাক্ত-মতে দীক্ষিত না হলে শক্তি পূজা করা প্রশস্ত নয়, তাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন। শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন 'প্রবীণ শক্তি-সাধক তখন কলকাতায় বৈঠকখানা বাজারে থাকতেন। রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে দীক্ষিত হবেন স্থির করলেন। শুভদিনে শাস্ত্রমতে রামকৃষ্ণ দীক্ষিত হলেন। বীজমন্ত্র কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণের অসাধারণ ভক্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। রামকৃষ্ণ যে শীঘ্রই ইষ্টলাভ করবেন এ-বিষয় তাঁর গুরু নিশ্চিত হলেন। রামকৃষ্ণকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

এদিকে রামকুমারের শরীর ক্রমশ অপটু হয়ে পড়তে লাগল। তখন স্বল্পায়াসসাধ্য রাধাগোবিন্দজীর পূজা তিনি নিজে আরম্ভ করলেন এবং মা ভবতারিণীর (দক্ষিণেশ্বরের কালীবিগ্রহের নাম ভবতারিণী) পূজা রামকৃষ্ণকে অভ্যাস করাতে লাগলেন। মথুরবাবু ঐ কথা শুনে পরম আনন্দের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণকে ৺কালীঘরের পূজক নিয়োগ করলেন এবং রামকুমার যথারীতি রাধাগোবিন্দজীর পূজা করে চললেন। রামকৃষ্ণের সাধক জীবনের পট পরিবর্তন হল।

ইচ্ছাময়ীর রহস্য কে বুঝতে পারে? ঐ সময় একটা অঘটন ঘটল যা রামকৃষ্ণের সাধক জীবনে এক নতুন প্রবাহ নিয়ে এল। রামকুমার অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ঐ অসুস্থ অবস্থায় বরানগরে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে কামারপুকুরে ফেরবার পথে মূলাজোড়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় আসেন এবং সেখানে রামকুমার দেহ

রাখেন। ঘটনাটি ঘটে ১২৬৩-র প্রথম দিকে। পিতৃতুল্য অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ গভীরভাবে ব্যথিত হলেন ঠিক, কিন্তু ঐ সময় থেকেই জগদম্বার পূজায় তিনি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলেন। রামকুমারের মৃত্যু রামকৃষ্ণের মধ্যে সংসারের অনিত্যতা বোধ একেবারে পাকা করে দিল। ঐ সময় তিনি লোকসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে চলতেন। পূজার সময় ছাড়া সর্বদা তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। রামকৃষ্ণের উদাস ভাব দেখে হৃদয়রাম খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি তখন সর্বক্ষণ রামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে পঞ্চবটীর পাশের জঙ্গলে গিয়ে হৃদয়রাম দেখতে পেলেন উলঙ্গ অবস্থায় রামকৃষ্ণ একটি বৃক্ষতলে গভীর ধ্যানমগ্ন। ধ্যানভঙ্গের পর হৃদয়রাম তাঁকে ঐ অবস্থায় ধ্যানের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে বললেন, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, মান, জাতি, অভিমান ও রূপ অষ্ট-পাশে জীব বদ্ধ, তাই সর্বস্ব ত্যাগ করে ধ্যান করতে হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ যা বিশ্বাস করতেন তা আচরণ করতেন, এবং যাচাই করে নিতেন। টাকা ও মাটি উভয়ের প্রতি সমবোধ না হলে মানুষ বিকারশূন্য ও প্রকৃত ঈশ্বরমুখীন হতে পারে না। এই বিশ্বাস পাকা করবার জন্য টাকা ও মাটি দুটিকেই একসঙ্গে জলে ফেলে দিয়ে তিনি নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়া যাচাই করে নিয়েছিলেন। সর্বজীবে শিববোধ—এ-চিন্তা দৃঢ় করবার জন্য কাঙ্গালীদের খাবারের ভুক্তাবশেষ দেবতার প্রসাদ মনে করে তিনি নিজের মাথায় দিতেন। কাম-কাঞ্চনে আসক্তি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস একসঙ্গে চলতে পারে না। মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এমন সব শারীরিক চিহ্ন এবং অনুষ্ঠানরহিত তপস্যা (তপসো ব্যাপ্য-লিঙ্গাৎ) সহায়ে মানুষ কখনও আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। সাধনায় উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মন স্থূল থেকে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম থেকে কারণে ক্রমশঃ উন্নীত হতে থাকে।

নিষ্ঠা, ভক্তি, ব্যাকুলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ যতই মা জগদম্বার পূজা করতে লাগলেন ততই তাঁর মনে মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠল। ব্যাকুলতায় মা সাড়া দিলেন। রামকৃষ্ণের প্রতি মা কৃপা করলেন। প্রথম মাতৃদর্শন সম্পর্কে রামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন,—"মার দেখা পাইলাম না বলিয়া হৃদয়ে তখন অসহ্য যন্ত্রনা…………অস্থির হইয়া ভাবিলাম তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম। ………… একটা অননুভূত জমাট বাঁধা আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, মার সাক্ষাৎ

প্রকাশ উপলব্ধি করিলাম। ......ঘর, দুয়োর, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল, কোথায়ও আর যেন কিছুই নাই, এক অসীম, জ্যোতিসমুদ্র,— যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল, উর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহা আমার উপর নিপতিত হইল, এবং আমাকে এক কালে তলাইয়া দিল। ......সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম"। ......'অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্য সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম মার বরাভয় করা চিন্ময় মূর্তি, দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকার সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।'[১০]

রামকৃষ্ণের দীর্ঘ বারো বছর (১২৬২-৭৩) কঠোর সাধনকাল বিচিত্র ঘটনায় পুর্ণ। ১২৬২-৬৫ এই প্রথম চার বছর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পুজক ছিলেন। ঐ সময় তাঁর মাতৃদর্শন, কঠোর সাধনা, দিব্যোন্মত্ত ভাব, বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রম করে প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি উচ্চমার্গের সাধনসকল—সবই বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণের উন্নত অধ্যাত্ম ভাবসকল যে বায়ুরোগ নয়, সেগুলি যে দিব্যোন্মত্ত ভাব তার প্রমাণ মেলে বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে ও তার পরবর্তী কালের সাধনায়। সর্বতোভাবে ঈশ্বর-তন্ময়তা ও তা-থেকে নানা ভাবের কথা শংকরাচার্য তাঁর 'বিবেক চূডামণি' গ্রন্থে বলে গেছেন। ব্যবহারিক জীবনের বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুন ও অভ্যাস-আচরণের মধ্যে সাধারণ মানসিকতা বদ্ধ, সেই মন ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের একজন পুর্ণ সাধকের ভাব ধরা যায় না। তাই সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদনা নিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের মনে ঐ সময় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

১২৬৬-৬৯—এই চার বছরের শেষ দুবছর রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণী ভৈরবী যোগেশ্বরীর কাছে গোকুলব্রত থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান তন্ত্রনির্দিষ্ট সাধন-সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করেন। ১২৭০-৭৩-সময়ের মধ্যে তিনি জটাধারী নামে একজন রামাইত সাধুর কাছে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন এবং রামলালা বিগ্রহ লাভ করেন। তা-ছাড়া, বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধি লাভের জন্য ছয়মাস তিনি স্ত্রী-বেশ নেন। পরে আচার্য তোতাপুরী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সমাধির সর্বোচ্চ (নির্বিকল্প) স্তরে আরূঢ় হন। পরিশেষে সুফী সাধক গোবিন্দর কাছ থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ নেন, এবং ঐ ধর্মের মূলভাব তিনি অভ্যাস করেন। তা-ছাড়াও ঐ বারো বছরের সাধনায় শেষের দিকে বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাব, কর্তাভজা ও নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের

সাধনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে তাঁর সাধনার সর্বদিক বা কোন একটি বিশেষ দিকের সর্বাঙ্গীন আলোচনা কোন একখানি সীমিত পরিসরের গ্রন্থে সম্ভব নয়। কারণ, যে দুঃসাধ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একজন দুর্জয় সাধকের দীর্ঘ বারো বছর সময় লেগেছিল তা কি কেবলমাত্র শব্দে ধরা যায়? যথাসম্ভব তার একটা বিবৃতি এখানে দেওয়া হবে।

সম্প্রদায়গত দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় যেন একটা প্রশ্ন দেখা দেয়—যেমন, একজন পূর্ণাভিষিক্ত শক্তি-সাধক (দিব্যাচারী তান্ত্রিক) বৈষ্ণব-প্রেম-ভক্তির সাধনায় একেবারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন এবং ভাবের চরম প্রান্তে উঠে যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈত-সাধনায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হয়ে (আমি-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয় হয়, উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণলোপে নির্বিকল্প সমাধির উদয় হয়) আচরণগত দিক থেকে ইসলাম ধর্মের মূলভাবে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের মূল উপদেশসকল গ্রহণ করলেন। সাধন-রাজ্যে এটা সত্যই বিস্ময়কর! ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-সম্পর্কে সাধারণ মনে একটা বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু পূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে অখণ্ড-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ধারা দেখলে দেখা যায় সেখানে বিরোধের কোন অবকাশ নেই। যুক্তির দিক থেকে বৈকল্পিক ন্যায়ের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় সাধনার দিক থেকে শক্তি ও ভক্তি[১১] এ দুটি পদ বিরোধী নয়। অর্থাৎ ভক্তি ও শক্তি সাধন রাজ্যে একই সঙ্গে চলতে পারে। আবার, জ্ঞান ও কর্ম এ দুটি পদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ নেই। এমন কি অদ্বৈত-বেদান্তে সাধন ক্ষেত্রে যেখানে কর্মের কোন স্থান নেই সেখানেও কর্মকে জ্ঞানের ছায়া বলা হয়েছে। তা-ছাড়াও, পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও একজন সাধক নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে পারেন, আবার একজন নিষ্কাম কর্মী নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হয়ে দেহ রাখতে পারেন। জ্ঞান যেমন একদিক থেকে পরম ভক্তির দিকে যেতে পারে, আবার ভক্তিও[১২] তেমনি পরা-জ্ঞানের পথ খুলে দিতে পারে। অতএব, আচরণগত দিক থেকে ধর্মক্ষেত্রে যে-অসঙ্গতি দেখা যায় তা সাম্প্রদায়িক-সাধনার দিক থেকে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নয়। অধ্যাত্মসাধন-রাজ্যে সাধকের কোন জাত-বিচার নেই। সব সাধনাই মূলত একই অখণ্ড চিতি-শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। ফলকথা, অধ্যাত্ম-সাধনার চরম স্তরে যে সকল সাধক উঠেছেন, তাঁরা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধ্য বস্তু নিয়ে অবাধে বিহার করতে পারেন। রামকৃষ্ণ ছিলেন সেই স্তরের একজন সাধক।

আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রথম চার বছর রামকৃষ্ণের সাধনার বৈশিষ্ট্য হল মাতৃদর্শন, যোগবিভূতি লাভ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করেন এবং সংসারের সর্ব বিষয়ের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করেন। ফলে, মনে তীব্র বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং বৈরাগ্য সহায়ে তাঁর মন-প্রাণ সকল প্রকার কামনা-বাসনা-মুক্ত হয়। সাধক রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য ও উদাসীন ভাবের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সিদ্ধ-সঙ্কল্প ঐ সকল সাধকের মধ্যে যোগৈশ্বর্য স্বাভাবিক ভাবে উদিত হয়, কিন্তু বিন্দুমাত্র কামনা-বাসনা না থাকায় ঐ সকল শক্তি তাঁরা কখনও প্রয়োগ করেন না। একমাত্র আধিকারিক পুরুষরাই (লোক-কল্যাণ সাধনের জন্য যাঁরা বিশেষ অধিকার বা শক্তি নিয়ে জন্ম নেন) সর্বতোভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন থেকে বহুজনের হিতের জন্য কখনও কখনও ঐ শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রশ্ন, মাতৃদর্শন লাভের পরেও রামকৃষ্ণকে আবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সাধনা করতে হল কেন?

উত্তরে বলা যায়, ধর্মবিশ্বাস-ক্ষেত্রে ঈশ্বর-দর্শন মনকে গভীর ভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করে ঠিক, কিন্তু প্রত্যয় ছাড়া কোন বিশ্বাস স্থিরনিশ্চয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তা-ছাড়াও, ব্যবহারিক বা আধ্যাত্মিক যে-কোন সাধন-সাপেক্ষ অনুভব পরীক্ষিত হওয়ার পূর্বে অনুভব মাত্র, মানসিক স্তরের ঐ অনুভব সত্যের পর্যায়ে পৌছায় না। ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ অনুভব সকলের শাস্ত্রানুমোদন ও অন্যান্য সত্যদ্রষ্টা আচার্যের অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতএব, কোন একটি সম্প্রদায়ের সাধনস্তরে রামকৃষ্ণের সাধনার সমাপ্তির রেখা টানা যায় না। রামকৃষ্ণের সাধনার নৈরন্তর্য ও গতি কোন স্তরেই স্তব্ধ হয় নি, তাঁর সাধনায় সাধ্য, সাধক সবই সাধনার অন্তর্ভূত হয়ে এক হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণের সাধনা মূলত অকালিক ও অখণ্ড।

তা-ছাড়াও, রামকৃষ্ণ-সাধনার আর একটা বড় দিক হল, সেখানে তাৎকালিক বিবদমান বিভিন্ন ধর্মমত সকলের মধ্যে একটা ঐক্য-সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাই তাঁকে আচরণগত দিক থেকে ধর্ম-জগতের নানা সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্ব সকলের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়েছিল। সমগ্র অধ্যাত্ম-পরিমণ্ডলের আচার্য হিসাবে রামকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ফলে, ব্যক্তি-মুক্তির মধ্যে তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শ সীমিত ছিলনা।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নিরন্তর ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাসে সাধক নিজের মনকে স্ব-বশে আনতে পারেন; ঐ মনই তখন তাঁর

শুরু হয়। ঐ সকল পবিত্র মনে যে-সব ভাবতরঙ্গ ওঠে, সে-সব ভাব সাধককে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া ত দূরের কথা, তাঁকে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সাধক রামকৃষ্ণের শুদ্ধ মন গুরুর মত তাঁকে পথ দেখিয়ে সাধনার প্রথম চার বছরেই তাঁকে মাতৃদর্শনের যোগ্য করে তোলে। শুধু তাই নয়, তাঁকে কখন কী করতে হবে, কাকে কী বলতে হবে, সে নির্দেশও তিনি যথাসময় তাঁর অন্তর্যামীর কাছ থেকে পেতেন। আবার কখনও কখনও কোন দেব-বিগ্রহ তাঁর অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে মূর্ত হয়ে তাঁকে উপদেশচ্ছলে ও কখনও কখনও ভয় দেখিয়ে সাধনপথে উৎসাহ দিতেন। একদিন শাণিত ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের দেহ থেকে বেরিয়ে তাঁকে বললেন, অবান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করে ইষ্ট চিন্তা যদি না করবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসিয়ে দেব। তা-ছাড়াও অনেক সময় তাঁর ভিতরের ভোগ-বাসনাময় পুরুষকে ঐ সন্ন্যাসী নিহত করে দূরস্থ দেব-দেবীর মূর্তি দর্শন করতে করতে বা কীর্তন গান শুনে আনন্দ উপভোগ করে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে রামকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করতেন।

ঐ সকল ঘটনা সাধারণ স্থূলবুদ্ধির লোকের মনে আজগুবি মনে হতে পারে, কিন্তু যে-চিত্তে বিবেকের উদয় হয় নি, তাঁর কাছে বিবেকদংশন শব্দটা যেমন অর্থহীন, তেমনি নৈতিক রাজ্যে যে প্রবেশ করে নি তার পক্ষে নৈতিক আদেশ বা নৈতিক বাধ্য-বাধকতা প্রভৃতি শব্দসকল কাল্পনিক মনে হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহের বোধ বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনুভবের খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ অলৌকিক দর্শন ও অনুভব সকল যে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, তা তাঁর পরবর্তী কালের বিস্ময়কর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আজ যান্ত্রিক যুগেও রামকৃষ্ণের ঐ-সকল অনুভব সম্পর্কে সাধারণ মনে কোন সংশয় নেই। 'চাপরাশ' (ক্ষমতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি) না পেয়েই সাধারণ সাধকরা যখন ঐ সব কথা বলেন তখনই মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ঐ সময় রামকৃষ্ণ যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন বা যা তিনি অনুভব করেছিলেন সে-সব কথা তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী ও শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী প্রমুখ সাধক-সাধিকার কাছে আবার শুনেছিলেন, বা তিনি যা পূর্বে জানতেন সে সব-কথা তাঁরা আবার তাঁকে জানালেন। শাস্ত্রীয় বিধি সকলের মান্য রাখবার জন্যই সম্ভবত ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও আরও অনেকে রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, রামকৃষ্ণের সাধনার জন্য যখন যে-ধরনের সাধকের প্রয়োজন হয়েছে, তাঁরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণের মহাসাধনায় অংশ নিয়ে সাহায্য করেছেন।

রামকৃষ্ণ-সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে আরও কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিল। দীর্ঘদিন পরে তিনি তাঁর বাস্তুভিটা কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। কারণ, তখন তিনি এত ভাবোন্মত্ত থাকতেন যে, বাঁধা-ধরা নিয়মে পূজা-অর্চনা ঠিকমত করতে পারতেন না। কামারপুকুরে এসে তিনি 'ভূতির খাল' ও 'বুধুই মোড়ল' শ্মশানে দিনরাতের অনেক সময় কাটাতেন। নতুন হাড়িতে মিষ্টি ও অন্যান্য ফল-সামগ্রী নিয়ে তিনি শ্মশানে যেতেন এবং বলি নিবেদন করবার সঙ্গে সঙ্গে শিবার দল সেখানে এসে হাজির হত, আর উপদেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মিষ্টির হাড়িগুলি শূন্যে মিলিয়ে যেত। আবার কখনও তিনি অশ্বত্থ গাছের নীচে জপধ্যানে অনেক সময় কাটাতেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধ্যাত্মপথ-যাত্রীদের সাধনার কোন এক বিশেষ স্তরে অশরীরী জগতের সন্ধান নিতে হয় এবং সে-জগৎ অতিক্রম করতে হয় চিত্তকে ভয়শূন্য করবার জন্য। আমরা পূর্বেই বলেছি, ভূত-প্রেতের ভয়ে যে-সব জায়গায় বয়স্ক লোকেরা যেতে সাহস করতেন না বালক গদাধর সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। ভয়কে যারা জয় করতে পারেন তাঁরা বীর, আর ভয়ের সংস্কার যাঁদের মধ্যে নেই। তাঁরা নির্ভীক। গদাধর একজন নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। নির্ভীক গদাধর ঐ সময় মায়ের অসিমুণ্ডধারী বরাভয় মূর্তি প্রায়ই দেখতেন।

গদাধরের মতিগতি দেখে তাঁর মা চন্দ্রাদেবী বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়লেন, তিনি ও গদাধরের মেজভাই রামেশ্বর গদাধরের বিয়ের পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু মনের মত পাত্রী না পেয়ে তাঁরা খুব হতাশ হয়ে পড়লেন। ভাবাবিষ্ট গদাধর হঠাৎ তাঁদের একদিন বললেন—আমার বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটি গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে আমার বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হয়ে রক্ষিত আছে।

বাংলা ১২৬৬-র বৈশাখ মাসের শেষের দিকে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার সঙ্গে গদাধরের বিবাহ হল, পাত্রীর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর, আর গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ। বিয়ের পর প্রায় এক বছর সাত মাস গদাধর কামারপুকুরে ছিলেন। ১২৬৭-র অগ্রহায়ণ মাসে বধূর বয়স প্রায় ৭-বছর পূর্ণ হল। কুল-প্রথানুযায়ী গদাধরকে একবার শ্বশুর বাড়িতে যেতে হল এবং শুভদিন দেখে নববধূসহ তিনি কামার পুকুর ফিরে এলেন। বাড়ীতে ফিরে এসে হঠাৎ তাঁর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যেতে প্রবল ইচ্ছা হল। কারও কোন বাধা না মেনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন এবং ৺শ্রীশ্রীমা জগদম্বার পূজায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। সাধক রামকৃষ্ণ জগৎ

সংসার সব ভুলে গেলেন। দিবা-রাত্র মায়ের স্মরণ, মনন, জপ-ধ্যানে তিনি নিবিষ্ট থাকতেন। তাঁর বুক সর্বক্ষণ লাল হয়ে থাকত। সংসার বা সাংসারিক কোন কিছু তিনি বুঝতে পারতেন না, তাঁর কাছে সাংসারিক সব কিছুই অদ্ভুত মনে হত। শারীরিক দিক থেকে বিষম গাত্রদাহ ও অনিদ্রায় তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। মথুরবাবু ঐ সময় রামকৃষ্ণের মধ্যে শিব-কালী মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন।

১২৬৭ (ইং ১৮৬১) সনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও সাধনায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। প্রথম রাণী রাসমণির মৃত্যু এবং দ্বিতীয়টি হল ভৈরবী যোগেশ্বরীর[১৩] দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন আরম্ভ ও যোগৈশ্বর্য লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা তখনও শাস্ত্রীয় দিক থেকে প্রমাণিত হয়ে পুর্ণতা লাভ করে নি। তাঁর সাধনা সম্পর্কে তখনও অনেকের ভুল ধারণা ছিল। শাস্ত্রীয় ধারায় আনুষ্ঠানিক তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে সাধক রামকৃষ্ণ যাতে শ্রীশ্রীমা জগদম্বার প্রসন্নতার অধিকারী হয়ে তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন. সেদিকে ব্রাহ্মণী ভৈরবী মন দিলেন। রামকৃষ্ণের একাগ্র ঈশ্বর-নিষ্ঠ মন ব্রাহ্মণী-নির্দিষ্ট তন্ত্র-সাধনার পথে এগিয়ে চলল। অনন্ত সমুদ্রের উর্মিমালার বিচিত্র ভাবতরঙ্গে ভেসে না বেড়িয়ে সর্বস্ব ছেড়ে সমুদ্রের তলদেশে ডুব দেওয়ার মত দুর্জয় সাহস অর্জনের জন্য রামকৃষ্ণের চিত্ত প্রস্তুত হল। সাধক রামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনার গূঢ় রহস্যের মধ্যে ডুব দিলেন, শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করলেন, কোন অবস্থায় চিত্তের ধৈর্য তিনি হারালেন না। ফলে. লাভ করলেন মায়ের বরাভয়। তাই পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের যে-কোন অবস্থায় বীর ও সাহসী হওয়ার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে রামকৃষ্ণ তখন শক্তি-সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। প্রজ্ঞাবতী, কর্মকুশলী ভৈরবী-ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়ার (বীরাচারী) উপযোগী উপকরণ সকল সংগ্রহ করতেন এবং ঐ সকল উপকরণের মূল্য ও তন্ত্র-সাধনায় তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে রামকৃষ্ণকে নানা উপদেশ দিতেন। নর, শিবা, সর্প প্রভৃতি চারটি প্রাণীর মুণ্ড গঙ্গাহীন দেশ থেকে ব্রাহ্মণী সংগ্রহ করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীর উত্তর দিকে বেল গাছের নীচে এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের তৈরী পঞ্চবটীর তলায় দুটি সাধনার বেদী তৈরী হল। ঐ মুণ্ডাসনের উপরে বসে জপ, পুরশ্চরণ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি ক্রিয়ায় রামকৃষ্ণ দিন কাটাতে লাগলেন। সারাদিন তাঁদের কি ভাবে কাটত সে সম্পর্কে দুর্জয় সাধক (রামকৃষ্ণ) ও কুশলী উত্তর সাধিকা (ভৈরবী) উভয়ের কোন হুঁস থাকত না। রাত্রিতে বেলগাছের নীচে বা পঞ্চবটীর তলায় সব

প্রস্তুত করে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে ডাকতেন এবং তন্ত্রমতে মা জগদম্বার পূজা সেরে তাঁকে জপ-ধ্যানে মগ্ন থাকতে বলতেন। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ঐ সকল কর্মের ফল রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতেন। দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, তখন অদ্ভুত কত কি তিনি দেখতেন, শুনতেন, তা কথায় বলে শেষ করা যায় না।

বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪-খানা তন্ত্রে[১৪] যত কিছু সাধনার কথা আছে সবগুলিকেই একে একে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দিলেন। যে-সকল দুরূহ সাধন আয়ত্ত করতে অতি উচ্চ স্তরের সাধকেরা পর্যন্ত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হন সাধক রামকৃষ্ণ অতি সহজেই তা আয়ত্ত করে ফেললেন। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ষড়্‌রিপু সকল জয় করবার জন্য তন্ত্রে যে-সকল বীরাচারী সাধন-প্রক্রিয়ার নির্দেশ আছে তার দুই-একটা নিদর্শন এখানে বিবৃত করা হল।

একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণী একজন সুন্দরী যুবতীকে কোথা থেকে নিয়ে এলেন, এবং তাকে বিবস্ত্রা করে দেবীর আসনে বসালেন এবং দেবীজ্ঞানে ঐ সুন্দরী যুবতীকে পূজা করার জন্য রামকৃষ্ণকে নির্দেশ দিলেন। রামকৃষ্ণ যথাবিধি ব্রাহ্মণীর নির্দেশ পালন করলেন এবং পূজা শেষ হল। ব্রাহ্মণী তখন জগজ্জননী জ্ঞানে ঐ যুবতীর কোলে বসে রামকৃষ্ণকে মা জগদম্বার জপ করতে বললেন। দিব্য-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রামকৃষ্ণ ঐ যুবতীর কোলে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিস্থ হলেন। আর একদিন মড়ার খুলিতে মাছ রেঁধে জগদম্বাকে নিবেদন করে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে ঐ মাছ খেতে বললেন। রামকৃষ্ণ তা খেলেন এবং তাঁর মনে কোন ঘৃণার ভাব এল না। আর একদিন একখণ্ড গলিত মহামাংস নিয়ে ব্রাহ্মণী হাজির হলেন এবং রামকৃষ্ণকে জিভ দিয়ে ঐ মাংস-খণ্ড স্পর্শ করতে বললেন। রামকৃষ্ণ ঘৃণায় শিউরে উঠলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী যে-মুহূর্তে নিজের জিভ দিয়ে ঐ মহামাংসখণ্ড স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা শক্তির তেজ রামকৃষ্ণকে অভিভূত করল। তিনি আত্মস্থ হলেন। ব্রাহ্মণী তখন ঐ মাংসখণ্ড রামকৃষ্ণের মুখে দিলেন। রামকৃষ্ণ তা নির্বিকারে গ্রহণ করলেন। এই ভাবে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—বীরাচার-নির্দিষ্ট পঞ্চ-'ম'কার[১৫] ও নানা তান্ত্রিক সাধনক্রিয়ার মাধ্যমে সাধক রামকৃষ্ণের চিত্ত থেকে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও ষড়্‌রিপুর কু-প্রভাব ও তৎ-সম্পর্কিত সংস্কারসকল দূর হল। তন্ত্রমতে বীরচার-নির্দিষ্ট সাধন সকল শেষ করে রামকৃষ্ণ আনন্দাসনে বসে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

সাধক রামকৃষ্ণের জীবদৃষ্টি কেটে গেল, শক্তির স্বরূপ-মহিমায় তিনি সংসারের সব কিছুকে শক্তিময় দেখলেন। প্রারব্ধের গণ্ডী তিনি কাটালেন, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় পূর্ণতার সাধনার দিকে এগুলেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ মুক্ত, কর্ম তখন তাঁদের মধ্যে কোন সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে না। সংসারের মধ্যে থেকেও তাঁরা সংসারের উর্ধ্বে। একমাত্র লোকহিতকর কর্মই তাঁদের কৃত্য। জীবত্বের শেষ অভিমানরূপ সংস্কারের জন্য তাঁরা সংসারে থাকেন, সংসারের কোন বন্ধন তখন আর তাঁদের স্পর্শ করে না। কিন্তু যে-সাধক পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি জগদম্বার স্বরূপ-শক্তির সন্ধান পেয়েছেন; স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য উভয়ই তখন তাঁর করতলগত হয়। ফলে, তাঁরা জীবত্বের শেষ অভিমান রূপ বন্ধন থেকেও মুক্ত। সংসারে থাকা-না-থাকা তখন তাঁদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন কোন বিশেষ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে তাঁর তিন দিনের বেশী সময় লাগে নি। স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ না করে বীরাচারী সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অতি অল্প সময়ে সিদ্ধি লাভ থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে, স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ ও পঞ্চ-'ম'-কার সাধন তন্ত্র-নির্দিষ্ট বীরাচারের বিশেষ অঙ্গ হলেও সর্ব স্তরের সাধকদের পক্ষে অবশ্য-কৃত্য নয়। আত্মিক শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি নিজেই সাধকের কাছে ধরা দেয় এবং সাধ্য বস্তু লাভে সাধককে সহায়তা করে।

১২৬৭-৬৯ দু'বছর পূর্ণোদ্যমে তন্ত্র সাধনা করে উগ্রতপা শক্তি-সাধক বৈষ্ণব-সাধনার দিকে আকৃষ্ট হন। জটাধারী নামে এক রামাইত সম্প্রদায়ের সাধুর কাছে বৈষ্ণব মতে রামকৃষ্ণ দীক্ষা নেন এবং বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় নিজকে সিদ্ধ করেন।

রামকৃষ্ণের সাধক-জীবন বিচিত্র, এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ১২৬২ সালে যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসেন তখন তিনি জানতেন না, তিনিই উত্তর কালের লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে যুগের প্রয়োজনে জগৎকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে এসেছেন এবং তাৎকালিক ধর্মচেতনাকে সংস্কৃত করে সমাজকল্যাণের কাজে লাগিয়ে সমাজকে সংহতির পথ দেখাতে এসেছেন। তখনও তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধারা অনুসরণ করে সৎ জীবন যাপন ও সংসার-ধর্ম পালন করবেন। সংসারে অপরের চেয়ে তিনি যে কোন-অংশে বিশেষ গুণসম্পন্ন, আজন্ম আত্ম-অভিমান শূন্য রামকৃষ্ণ কখনও তা ভাবেন নি।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সবই বিপরীত হল। এক অপূর্ব দৈব-শক্তি তাঁকে যেন সংসারের রূপ, রস থেকে সরিয়ে কোন এক নিগূঢ় রহস্যময় অধ্যাত্ম রাজ্যে নিয়ে

গেল, কোন ভোগ্য বস্তুর প্রতি তাঁর কখনও কোন আকর্ষণ দেখা যায় নি। তা-ছাড়াও, রামকৃষ্ণের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর, যা তিনি একবার শুনতেন তা তিনি কখনও ভুলতেন না। মা-জগদম্বার সন্তান জ্ঞানে তিনি শুনতে পেতেন, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু' - এ কথা শুনে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর কখনও কোন আকর্ষণের ভাব জাগে নি।

বৈষ্ণবোক্ত মধুর ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ ভাব-সাধনার চরম ভূমিতে উন্নীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সর্বভাবের অতীত অদ্বৈত-সাধনার প্রবল প্রেরণা দেখা দিল। অদ্বৈত-সাধনার ব্যবস্থা মা জগদম্বা যথা সময়ে করে দিলেন। ১২৭১-র শেষ ভাগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী গোস্বামী[১৬] দক্ষিণেশ্বরে এলেন। অদ্বৈত-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মুক্ত সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রায় উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। পুরীর মন্দিরে যাওয়ার পথে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। অদ্বৈত-সাধনার যোগ্য আধার দেখে তিনি ঐ সাধনায় রামকৃষ্ণকে প্রবিষ্ট হতে বললেন। মধুর-ভাব সাধনার চরম স্তরে উঠে রামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনার প্রতি প্রবল আকর্ষণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা যায়, ভাব ও ভাবাতীত উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধির জন্যই সম্ভবত রামকৃষ্ণের ঐ ইচ্ছা হয়েছিল। রামকৃষ্ণের নিজের কথায় বলা যায়, "রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার মনে হইত, অনন্ত ভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাহাকে নানা ভাবে দেখিব

অদ্বৈত-সাধনায় বসার আগে শিখা-সূত্র সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি। কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রেমময় সত্তা নিজের গর্ভধারিণীর (তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন) মানসিক ক্লেশের কথা ভেবে তিনি শিখা-সূত্র ত্যাগ না করেই গোপনে সন্ন্যাস নিলেন। শুভ মুহূর্তে যথাবিধি তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা[১৭] গ্রহণ করে তাঁর নিদেশে পিতৃপুরুষদের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং নিজের শান্তির জন্য পিণ্ডদান করলেন। রাত্রি শেষে শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে হোমাগ্নি জেলে সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে পড়ালেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহস্পর্শে সমগ্র পরিবেশে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। প্রচলিত কথা হল, সন্ন্যাস দীক্ষার সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গদাধরের রামকৃষ্ণ[১৮] নামকরণ করেন। কারও কারও মতে মথুরবাবু গদাধরকে ঐ নামে প্রথমে ডাকেন। আবার ঠাকুর নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'পূর্ব, পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই ইদানীং (নিজের দেহ দেখিয়ে) এই খোলটার মধ্যে এসেছেন। তবে এবার গুপ্তভাবে আসা, রাজা যেমন ছদ্মবেশে জগৎ দেখতে বেরোন।'

'নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব,' দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তু সৎ, আর সব কিছুই ভ্রান্তি, মায়া—তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে ঐ-কথা মনন করতে নির্দেশ দিলেন এবং মনকে সর্বতোভাবে বিকল্পমুক্ত করে আত্ম-ধ্যানে নিমগ্ন হতে বললেন। মনকে বিকল্পমুক্ত করে রামকৃষ্ণ মনকে নাম-রূপের ঊর্ধ্বে তুলতে পারলেন না। পার্থিব সব কিছু থেকে মনকে সরিয়ে আনতে পারলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁর মনকে কিছুতেই নাম-রূপের স্তর অতিক্রম করতে দিল না। তিনদিন চেষ্টা করেও রামকৃষ্ণ যখন মনকে সম্পূর্ণ বিকল্প-মুক্ত করতে পারলেন না, অর্থাৎ নির্বিকল্প স্তরে তুলতে পারলেন না, তখন তিনি হতাশ হয়ে তাঁর অদ্বৈত-সাধনার গুরু তোতাপুরীকে বললেন, 'না, কিছুতেই আত্ম-নিমগ্ন হতে পারলাম না।' তোতাপুরী তখন ভীষণ, উত্তেজিত হয়ে এক টুকরো কাঁচ দিয়ে রামকৃষ্ণের ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থল সজোরে বিদ্ধ করলেন, এবং ভ্রূ-মধ্যস্থিত বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনতে বললেন। ষট্চক্রের দিক থেকে ঐ স্থানটি আজ্ঞাচক্র নামে অভিহিত হয়। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে রামকৃষ্ণ এবার ধ্যানমগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় তাঁর মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে ঐ মূর্তিকে তিনি দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং হু হু করে সমগ্র নাম-রূপের ঊর্ধ্বে উঠে পূর্ণ সমাধি-মগ্ন হলেন। তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল, প্রশান্ত গম্ভীর প্রীতিপূর্ণ মুখে নিবাত, নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় রামকৃষ্ণের চিত্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে রইল।

তোতাপুরী স্তম্ভিত হলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তিনি কঠোর সাধনা করে যা লাভ করেছেন, মাত্র তিন দিনে সাধক রামকৃষ্ণ তা পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেললেন। এ কি অভূতপূর্ব বিস্ময়! বৈদান্তিক তোতাপুরী তখনও জানেন না, বাংলার শক্তি-ভক্তি সাধনার দুর্জয় প্রভাব। জানেন না জগদম্বার লীলা সাধন-রাজ্যে সাধককে কতদূর নিয়ে যেতে পারে।

'হরি ওম্'-মন্ত্রের সুগভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটীর চতুর্দিক পূর্ণ করে তোতাপুরী তাঁর প্রিয়-শিষ্য রামকৃষ্ণকে সমাধি থেকে তুললেন। নির্বিকল্প সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে সাধক রামকৃষ্ণ অদ্বৈত-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন। ঐ সময় বহু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে এসেছিলেন এবং 'অস্তি, ভাতি, প্রিয়, অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্ত-প্রসিদ্ধ বাক্যের আলোচনায় দক্ষিণেশ্বর মুখরিত হয়ে থাকত। নির্বিকল্প সমাধিতে ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস ছিলেন, পরে তিনি স্ব-ভাবে স্থিত হন।

অদ্বৈত-ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, 'উহা শেষ কথার শেষ কথা…জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ'।[১৯] অদ্বৈত-মতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠাকুরের মন এত উদার-

ভাবাপন্ন হয়েছিল যে, তিনি সুফী সম্প্রদায়ের ফকির গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা নেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

সাধক রামকৃষ্ণের সাধনার শেষ পর্ব উপস্থিত—তাঁর শেষ সাধন-যজ্ঞ হল 'ষোড়শী পূজা'। ১২৮০-র জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার ফলহারিণী কালীপূজার পুণ্যতিথি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সেদিন বিশেষ অনুষ্ঠান। কিন্তু পূজার আয়োজন সেদিন মন্দিরে না হয়ে গুপ্তভাবে ঠাকুরের ঘরে হচ্ছে। রাত্রি ন-টার সময় রহস্যপূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। মাতাঠাকুরাণীকে (শ্রীশ্রীসারদা মা) পূজার সময় উপস্থিত থাকতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ পূজায় বসলেন। পূজার সামগ্রীসকল শোধন করলেন। আলপনা দেওয়া আসনে ঠাকুর 'শ্রীমা'-কে বসতে বললেন। পূজা দেখতে দেখতে মা আগেই অভিভূতা হয়ে পড়েছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধার মত তখন পুর্বদিকে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে তিনি উত্তরাস্যা হয়ে বসলেন। শ্রীমার শরীরে মন্ত্রাদির যথা-বিধানে ন্যাস করে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ঠাকুর তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং ভোগ নিবেদন করে নিবেদিতভোগের কিছুটা অংশ মায়ের মুখে দিলেন। মায়ের বাহ্য-জ্ঞান লোপ পেল। মা সমাধিস্থ হলেন। আত্ম-সমাহিত পূজক পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থা পূজ্যা দেবীর সঙ্গে পুর্ণভাবে একাত্ম হলেন। শিব-শক্তি সামরস্যার এক অভূতপুর্ব দৃষ্টান্ত দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে বাহ্য-চেতনার উদয় হল। তখন তিনি দেবীর উদ্দেশে আত্মনিবেদন করলেন এবং নিজকে দেবীর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাঁকে প্রণাম করলেন।

পূজা শেষ হল। ভারত তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে রহস্য-পূজার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লিখিত হল। ভক্ত সাধকগণ ধর্মজগতে এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে দেবী জ্ঞানে পূজার মধ্য দিয়ে দেব-মানবের ব্যবধান ঘুচে গেল, সাধন রাজ্যে নারী দেবী-শক্তিতে রূপান্তরিত হল।

সাধক রামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা দেখে তাঁকে সর্বাগ্রে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। পরে অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন, এবং নানা শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়ে ঐ দর্শন মিলিয়ে নেওয়ার অবসর দেন। অতএব, ৺মায়ের কাছে এখন তিনি আর কী চান? চৌষট্টি খানা তন্ত্রের সাধন একে একে শেষ হয়েছে। বৈষ্ণব তন্ত্রের পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতবর্ষে প্রচলিত



শ্রীমা

আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সনাতন বৈদিক মার্গানুসারী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ, নিরাকার রূপের দর্শন হয়েছে এবং জগদম্বার অচিন্ত্য লীলায় ভারতের বাইরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনার ফল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব, 'তাঁর নিকট আর তিনি কি পাইতে বা শুনতে চাইবেন'? মার মধ্যে ডুবে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন চাহিদা নেই।

শংকর-বেদান্ত অধ্যাত্ম-শক্তি-পথগামী যতি সম্প্রদায়ের একান্ত কাম্য। হরিদ্বারে গুরুকুল সম্প্রদায়ে ঐ বিষয়ের বিশেষ ভাবে পঠন-পাঠন, সাধ্য-সাধন হয়। সেই সুদূর পশ্চিম থেকে তোতাপুরী গোস্বামী (ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাকে ল্যাংটা বলতেন) দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুরকে অদ্বৈত-সাধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সাধক রামকৃষ্ণ পূর্বেই ভৈরবী যোগেশ্বরীর কাছে তন্ত্র-সাধনার নানা দিক শিক্ষা করে দিব্য স্তরে অভিষিক্ত হয়েছেন। ভৈরবীর তত্ত্বাবধানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে (এই আসনে একমাত্র অভিষিক্ত সাধকেরা বসবার যোগ্য) বসা থেকে আরম্ভ করে বীরাচারী সাধনার অংশ-বিশেষ পঞ্চ-'ম'-কার কৃত্য শেষ করে তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হয়েছেন এবং শক্তির ক্রমিক ধারায় সাধনার একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে মহাশক্তির অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছেন। শক্তি-সাধনার চরম স্তরে উঠে তিনি বৈষ্ণবোক্ত ভাব-সাধনার দিকে আকৃষ্ট হলেন। রামাইত সম্প্রদায়ের সাধক জটাধারীর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি বাৎসল্যভাব সাধন করেন। বৈষ্ণবোক্ত ভাব-সাধনার চরম স্তরে উঠে তিনি ভাবাতীতের উপলব্ধির দিকে ঝুঁকে পড়েন। সাধক রামকৃষ্ণের মানসিক গঠনের মধ্যে এমন এক দুর্জয় গতিপ্রবাহ ছিল যে, সাধনার কোন স্তরেই তিনি নিজেকে বদ্ধ রাখেন নি। অধ্যাত্ম-রাজ্যে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী, এক প্রচণ্ড গতিশক্তি। তাই কট্টর অদ্বৈত-পন্থী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট জ্ঞান-সাধন রামকৃষ্ণের বংশ-পরম্পরা, অনুভব, বাংলার জল-বায়ু-মাটি ও শক্তি-ভক্তি সাধন ধারার দিক থেকে আপাত-বিরোধী বলে সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেও 'যত মত, তত পথ'-এর প্রবক্তা সহজেই ঐ সাধনা আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন। আজ্ঞাচক্রের রহস্য ভেদ করে সাধক রামকৃষ্ণ উঠেছিলেন নির্বিকল্পক সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে। প্রাণের সূক্ষ্মস্পন্দন ঐ স্তরে কেটে যায়। চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়ে সাধক রামকৃষ্ণ খুঁজে পেলেন আত্মস্বরূপ, সমগ্র বিশ্ব ঘনীভূত হল আত্ম-চেতনার কেন্দ্র-বিন্দুতে, বেদান্তের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', সাধক রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করলেন চেতনার আলোকে, তোতাপুরী স্তম্ভিত হলেন।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী এক ও অদ্বিতীয়, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন

ভেদ নেই, দক্ষিণেশ্বরে এসে এ-কথা নতুন করে শিখলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী। এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করা হবে, যা-থেকে মায়ের অপূর্ব লীলার কথা পরিস্ফুট হবে। রক্তামাশায়-ক্লিষ্ট তোতাপুরী সাধন-লব্ধ সম্পদ সর্বস্ব পণ করেও দেহ-বোধ থেকে যখন মুক্ত হতে পারলেন না তখন তিনি আত্মঘাতী হবেন সঙ্কল্প করলেন। গঙ্গায় ডুবে মরবেন স্থির করলেন। পশ্চিমের জলবায়ুতে মানুষ হঠযোগে সিদ্ধ-সাধক তোতাপুরী সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধ্যান, ধারণা ও অসঙ্গ বাস করার ফলে নির্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির ও বৃত্তিমাত্রহীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও পরমেশ-শক্তি, অনাত্মবিদ্যা ও মায়ার দুরন্ত প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানতেন না, মহা-ইচ্ছাময়ী ভবতারিণীর ইচ্ছা পুর্ণ না হলে তাঁর সাধনা পূর্ণতার স্তরে যেতে পারে না। নিবিকল্প-সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ঘটেছে ঠিক, মুক্তির আনন্দ তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টি-রহস্যের মূলীভূত শক্তি-চৈতন্যের স্বরূপ মহিমা তিনি তখনও উপলব্ধি করেন নি, ফলে তিনি জীবন্মুক্ত হলেও তাঁর অধ্যাত্ম শক্তি তখনও পূর্ণতার স্তরে প্রবেশ করে নি।

পুরীজি কয়েকদিন রক্তামাশয়ে ভুগছিলেন, একদিন রাত্রিতে তাঁর পেটের যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেল। পুরী-মহারাজ খুব অস্থির হয়ে উঠলেন। রাত্রিতে বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে বসলেন, বসেও সোয়াস্তি নেই, সমাধি-ভূমিতে যতবার তিনি মনকে তোলবার চেষ্টা করলেন ততবার মন দেহস্থ পরিধির উর্ধ্বে যেতে পারল না। নিজের দেহের উপর তিনি খুব বিরক্ত হলেন, ভাবলেন, পচা দেহটার সঙ্গে থেকে আর কেন কষ্ট পান! এই গভীর রাত্রিতে দেহটাকে বিসর্জন দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান হোক। মনকে ব্রহ্ম চিন্তায় স্থির রাখবার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে তিনি গঙ্গায় নামলেন এবং গভীর জলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এ কি! ভাগীরথী কি আজ শুকিয়ে গেছে? না তোতাপুরীর কাছে আজ সবটাই আজব কল্পনা। ভাবতে ভাবতে তোতাপুরী প্রায় গঙ্গার ওপারে চলে গেলেন। কিন্তু কোথাও তিনি ডুব-জল পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তবে এ কি সব অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, না, ঈশ্বরের লীলা। 'লীলা'-শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাঁর ভিতর থেকে বুদ্ধির আবরণ টেনে নিল, তোতাপুরীর চোখ উজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলসে উঠল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, অচিন্ত্য-শক্তি-রূপিণীকে। তিনি দেখলেন জলে-স্থলে সর্বত্র মা; শরীর, মন, বুদ্ধির পারেও মা, তুরীয় নির্গুণময়ী মা! তিনি এতদিন ব্রহ্মজ্ঞানে যাকে উপাসনা করে এসেছেন, সেই মা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মময়ী-মাতৃশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করলেন।

গভীর রাত্রে তিনি মা জগদম্বার অচিন্ত্য, অব্যক্ত বিরাটরূপের দর্শন করতে করতে মা মা চীৎকারে চারিদিক মুখরিত করে তুললেন, এবং মায়ের পায়ে নিজকে সঁপে দিয়ে যে-ভাবে এসেছিলেন সেই-ভাবে ফিরে গেলেন। সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব আনন্দে তোতাপুরীর প্রাণ আজ উল্লসিত। ধীরে ধীরে তিনি পঞ্চবটীর তলায় তাঁর আসনে এসে বসলেন এবং সারা রাত তিনি জগদম্বার ধ্যানে কাটালেন।

সকাল বেলা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর সংবাদ জানতে গিয়ে দেখেন, তোতাপুরী যেন সে মানুষই নন। মুখে সামান্যতম ক্লান্তির ছাপ নেই, মন খুসীতে ভরা। রামকৃষ্ণকে দেখে তিনি পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন, এবং পূর্বরাত্রির সব ঘটনা তাঁকে বললেন। মায়ের দর্শন পেয়ে ও মায়ের কৃপা লাভ করে তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন। তাঁর মনের সব দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। তিনি বুঝেছেন তাঁর অদ্বৈত-সাধনাকে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন এবং এতদিন সেখানে রেখেছিলেন। কারণ, প্রব্রজ্যা নিয়ে তিন দিনের বেশী তাঁরা কোথায়ও থাকেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তোতাপুরীর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার পর্ব শেষ।

প্রভাতী সুরে নহবত ধ্বনি শুনে শিব-রামের মত গুরু-শিষ্য (তোতাপুরী-রামকৃষ্ণ) মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন। প্রভাতের অরুণ আভায় চারিদিক ঝলমল করে উঠেছে। মা-র মন্দিরের দরজা খুলে গেল। তোতাপুরী মা ভবতারিণীকে সাক্ষাৎ দর্শন করলেন। অনাস্বাদিত আনন্দে তোতাপুরীর মন ভরে গেল। তিনি তৃপ্ত হলেন। জ্ঞান-সাধক এতদিনে শক্তির মহিমা উপলব্ধি করে পূর্ণ হলেন। তোতাপুরী-রামকৃষ্ণ গুরু-শিষ্যের অপূর্ব মিলনে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস সেদিন মুখর হয়ে উঠল। মা ভবতারিণীর মধ্যে তোতাপুরী প্রত্যক্ষ করলেন সৃষ্টি-রহস্যের আদি চৈতন্য-শক্তি। অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে শক্তি ও শক্তিমান যে এক ও অভিন্ন, তার বাস্তব ভিত্তি রচিত হল। তোতাপুরী মা ভবতারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। লোটা-কম্বল নিয়ে তিনি পশ্চিমের পথে যাত্রা করলেন। শোনা যায়, তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে ফেরেন নি। কিংবদন্তী আছে, মহাবৈদান্তিক 'নাঙ্গা বাবা'—২৬২-বছর বয়সে যিনি দেহ রেখেছেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত-সাধনার গুরু শ্রীমৎ-তোতাপুরী।

সাধক রামকৃষ্ণ গেয়েছেন, 'কালী কল্পতরু মূলে রে মন'।

প্রশ্ন, এই কালী কে? ইনি কি মন্দিরের পাষাণময়ী মূর্তি, না চৈতন্যময়ী শক্তি?

রামকৃষ্ণ বলেছেন—'কালী নির্গুণা ও সগুণা, সাকারা ও নিরাকারা;

আবার তিনি সকলেরও অতীতা এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নন।' বিচিত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি আরও বলেছেন,—'যারই নিত্য, তারই লীলা, আবার যারই লীলা, তারই নিত্য। যিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই এক, পরমাত্মা, বিশ্ব-চৈতন্য সব হয়েছেন। বাপ, মা, প্রতিবেশী, জীব, জন্তু, ভাল, মন্দ, শুচি, অশুচি, সমস্ত'। তিনি আরও বলেছেন, 'ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয়, ভেদ বুদ্ধি, ভাল-মন্দ বোধ ততক্ষণ থাকবেই।'

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ পথের সাধক ছিলেন? উত্তর, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন বাঁধা-ধরা পথ ধরে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধন শুরু করেন নি। তিনি ছিলেন স্বভাব-সাধক। আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। কারণ, কোন দুঃসাধ্য সাধন-পথ অতিক্রম করতে তাঁর তিন দিনের অধিক সময় লাগে নি। তাঁর সাধনার ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত অনুভব, অলৌকিক দর্শন, শ্রবণ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি অতি বাল্যকাল থেকেই সাধনপথে যাত্রা শুরু করেন এবং যখনই যে ধারার সাধনার পক্ষে শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন হয়েছে সেই ধারার যোগ্য গুরু এসে তাঁর কাছে হাজির হয়েছেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম সবই তাঁর সাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, সিদ্ধি ক্রিয়ায়, এবং উন্মেষ জ্ঞানে। ভক্তি-সাধক, শক্তি-সাধক, জ্ঞানী, প্রেমিক যে-কোন সম্প্রদায়ের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর সাধনার দিক-দর্শনের আলো পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অনন্যতা সেখানেই।

শৈব-সাধক বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দ কি শক্তি-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য উত্তর-সাধক? এ-বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়, রামকৃষ্ণ-সাধনার প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ নিজেই। তবে বিবেকানন্দর শিক্ষা, দীক্ষা ও আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার বিরোধী নয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি প্রচলিত আভিচারিক ক্রিয়া প্রকৃত তন্ত্র বা শক্তি সাধনা নয়। বিভূতি-বাদ বা অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ তন্ত্র সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সাধনার পথে সাধককে আসনচ্যুত করার জন্য ঐ সকল যোগৈশ্বর্যের প্রলোভন আসে। সিদ্ধাই সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, 'ও সকলে আছে কি? ও সব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়।' আবার পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে পঞ্চ-'ম'-কার বীরাচারী সাধনার অনিবার্য অঙ্গ হলেও তন্ত্রের মূল উপজীব্য নয়। তন্ত্র-সাধনা মূলত প্রাণ ও চৈতন্য শক্তির জাগরণ, চৈতন্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে

মাটির পৃথিবীতে অবতরণ। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে শিবলোকে অবস্থান, সৃজনী-শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণতা লাভ। আবার বেদান্তের মহাবাক্যের প্রায়োগিক বা সাধনার দিক হল তন্ত্র। ফলে, তন্ত্র ও বেদান্ত-সাধন, মূল লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোন মৌল বিরোধ নেই। অতএব, বিবেকানন্দের 'শিবোহং' বা 'সোঽহং'-বাদ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রতিধ্বনি।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এখানে আর একটি প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বৈশিষ্ট্য কোথায়? কোথায় ঐ সাধনার মৌলিকতা?

ভারতবর্ষের অঞ্চলবিশেষ অধ্যাত্ম সাধনার পীঠস্থান; কাশী, কাঞ্চী, হরিদ্বার, কনখল, ও নর্মদার তীরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল, অধ্যাত্ম ভারতের সাধনার গৌরব-গাথায় সমুজ্জ্বল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য,—পঞ্চোপাসক ছাড়াও আউল, বাউল, অওঘড়, অঘড়, হংস, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যোগী, অবধূত, অঘোরী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীতে ভরা এই পুণ্য ভারত ভূমি। তা-ছাড়াও, শ্রীমৎ শংকরাচার্য প্রবর্তিত গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, প্রভৃতি দশনামী সম্প্রদায়ের যতিগণ অধ্যাত্ম ভারতের সাংস্কৃতিক পরম্পরা আজও বহন করে চলেছে। স্থির, গম্ভীর, মৌনী ভারতের অন্তরাত্মা স্পর্শ করলে আজও ভারতের অধ্যাত্ম বাণী শোনা যায় গিরিকন্দরে, পুণ্যসলিলা নদীবক্ষে, গভীর অরণ্যে, মঠ-মন্দিরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তীর্থক্ষেত্রে। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় এই ভারতেই রাজার ছেলে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, ধনী ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছেন, রাজা ঋষিত্বে উন্নীত হয়ে রাজ-কর্তব্য পালন করেছেন। সেই অধ্যাত্ম-ভারতের মানচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়, কী বা কোথায় তাঁর বৈশিষ্ট্য?

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রকাশ অধ্যাত্ম-চেতনায়, প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, এবং সিদ্ধি ক্রিয়ায়, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। মাতৃজ্ঞানে শক্তি-সাধন, বৈদান্তিকের দণ্ডগ্রহণ ও নির্বিকল্প-সমাধিতে উত্তরণ, দেশ-কালের অলঙ্ঘ্য গণ্ডি অতিক্রম করে পূর্ণত্বে অধিষ্ঠান এবং প্রারব্ধের রহস্য ভেদ করে মনুষ্য-জীবনের জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র ইতিহাসের উপলব্ধি—সবই তাঁর অধিগত ছিল। পরিণামে অমৃতত্ব লাভ করে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে তিনি উঠেছিলেন। শক্তি-চেতনার সূত্র ধরে তিনি অতিক্রম করলেন প্রাণ-শক্তির গণ্ডি, স্বরূপত চৈতন্য-শক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি আবিষ্কার করলেন আত্মস্বরূপ মহিমায়, উপলব্ধি করলেন এমন এক অবস্থা যেখানে রবি-শশী স্তব্ধ, নক্ষত্র জগৎ অবলুপ্ত, ছায়া-ছবির ন্যায় সমগ্র বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশে ঘুরে চলেছে। জীব-চেতনার সূক্ষ্মতম অভিমান-রূপ সংস্কার সেখানে নির্লিপ্ত, কর্মবীজ দগ্ধ, সাক্ষী-স্বরূপ

চৈতন্যে বিধৃত হয়ে আছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আন্তর বৃত্তাকারে। বিকল্পের জনক কাল সেখানে কুক্ষিগত হয়েছে কালসঙ্কর্ষিণীশক্তিতে। চৈতন্য-শক্তির অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তির রূপান্তর ঘটে, স্থূল বিশ্ব তখন চিন্ময় হয়ে ওঠে। সংহারের পরবর্তী স্তরে তিরোধান শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিকল্প বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে চিত্ত শান্ত, নিস্তরঙ্গ ভাব পায়। পরবর্তী ধাপে অনুগ্রহ-শক্তির প্রকাশ, নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রে ঊর্মি বা তরঙ্গের অনুভব, শিবলোকে উত্তরণ। মহাশক্তি-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সে-শক্তির আভাস সাধক-সমাজকে দিয়ে গেছেন।

ভারতীয় চিন্তায় আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা-বোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র এখানে শ্রুতিনির্ভর। তাই ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা সব সময়েই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনায সিদ্ধি লাভ করে পূর্ণ মানবতার স্তরে নামলেন তাৎকালিক বিভ্রান্ত ভারতকে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় গ্রহণ, অনুভব, বিশ্লেষণ ও উত্তরণে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি তাৎকালিক বিবদমান বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসার জন্য এক অভিনব সূত্র আবিষ্কার করেন। সূত্রটি হল 'যত মত, তত পথ'—এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিশেষ ভাবে আচরণের দিক থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, একজন দিব্যাচারী তান্ত্রিক [বেদান্তের উত্তম অধিকারী হলেন/তন্ত্রেরদিব্য ভাবের ভাবুক, মধ্যম অধিকারী বীরভাবের এবং অধম অধিকারী পশুভাবের সাধক] ও একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—উভয়ের মধ্যে সাধনাংশে বা উপলব্ধি/স্তরে কি কোন বিরোধ থাকতে পারে? বা, একজন শক্তিসাধক ও একজন ভক্তিসাধক—দুইয়ের সাধনার মধ্যে শক্তি-চৈতন্যের দিক থেকে কি কোন অসঙ্গতি দেখা যায়? দুটি প্রশ্নের একই উত্তর-'না'। কারণ দিব্যাচারী তন্ত্রসাধক ও একজন বৈদান্তিক (জ্ঞানপথের সাধক)-উভয়ের সাধনার লক্ষ্য-বস্তু এক, ও পরিণাম পরমপদ প্রাপ্তি; উভয়ের মধ্যে যে আপাতপার্থক্য দেখা যায় তা হল পদ্ধতিগত দিক থেকে। বৈদান্তিক এটা নয়, ওটা নয়, নেতি, নেতির সূত্র ধরে মহাবাক্য শ্রবণ, মননও নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-তত্ত্বে পৌছান, আর অন্যজন ইতির মহিমা শেষ করে পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তিকে উপলব্ধি করেন এবং তার অপার করুণা লাভে সমর্থ হন। তত্ত্বগত দিক থেকে তন্ত্রমতে শক্তি ও শক্তিমান-উভয়ের মধ্যে .কোন ভেদ নেই। বেদান্ত মতেও শক্তি অস্বীকৃত নয়। কিন্তু

সে কোন্ শক্তি ? সে শক্তি নয় মায়া। মায়া ব্রহ্মাশ্রিত হয়েও জড়ের মূল উপাদান। কিন্তু তন্ত্রে যে-শক্তির কথা পরম শিবের স্বরূপের দিক থেকে বলা হয়েছে, তা হল চিতিশক্তি। ব্রহ্মবাদীর ভাষায় ইনিই ব্রহ্মময়ী সনাতনী। তাই সাধনার দিক থেকে তন্ত্রকে বেদান্তের প্রায়োগিক দিক বলা যায়। দ্বিতীয়ত, অধ্যাত্ম দিক থেকে শক্তি ও ভক্তি-সাধক উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কারণ উভয়েই মূলত শক্তিসাধক, 'হ্লাদিনী শক্তি' ও 'চিতিশক্তি' উভয়ের মধ্যে কোন গুণগত বিরোধ নেই। বৈষ্ণবোক্ত তন্ত্র একই ধারার সাধনার মধ্য দিয়ে 'ভেদ' ও 'ভেদাভেদ' তত্ত্বে পৌঁছান। আর শাক্তভন্ত্রের মধ্য দিয়ে 'শাক্তাদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য দিক থেকে, প্রেমের অপার মহিমায় 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্ব উজ্জ্বল, আর চিতি-শক্তির অপার করুণায় 'শাক্তাদ্বৈতবাদ' ভাস্বর। ব্যবহার-ভূমিতে যে পার্থক্য দেখা যায় তা পদ্ধতি ও আচরণগত দিক থেকে। বৈষ্ণবতন্ত্র মূলত তন্ত্রেরই একটা উল্লেখযোগ্য দিক। প্রসঙ্গত এখানে বৌদ্ধতন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সাধন-রাজ্যে কোন জাত-বিচার নেই, সব সাধকই এক, পার্থক্য শুধু স্তরভেদে। সাধনার অধিকার-ভেদের যে-প্রশ্ন দেখা যায় তা সংস্কারগত, জাতিগত নয়। কারণ, জন্মের দিক থেকে সবাই শূদ্র, সংস্কারই সাধনরাজ্যে সাধককে উন্নীত করে।

ঈশ্বরলাভের পক্ষে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হতে হবে, এ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-বিচারে দেখা যায় না। আজীবন সাদা কাপড় পরে (কখনও বগলে করে), সাধারণ মানুষের ন্যায় বসবাস করে তিনি আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। সন্ন্যাসী ছাড়াও গার্হস্থ্য ধর্ম সম্যক্ পালন করে একজন আদর্শ গৃহী যে ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী হতে পারেন সেটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও আচরণের অভিপ্রায়। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, ত্রৈলঙ্গস্বামী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় সম্পর্কে বলেছিলেন, যে-স্তরে উঠতে তাঁর নেংটি ত্যাগ করতে হয়েছে শ্যামাচরণ কিন্তু কাপড় পরে অনায়াসে সে-স্তরে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে দুর্গাচরণ নাগ, শ্রীবলরাম বসু প্রভৃতি অনেক আদর্শ গৃহী উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন।

কোনও ধর্মমত বা পথকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই বর্জন করতেন না। গ্রহণই ছিল রামকৃষ্ণ-সাধনার প্রাথমিক শিক্ষা। অনুভবে প্রাপ্ত উপাত্ত সকলকে তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতেন মনস্তাত্ত্বিক ধারায়, যাচাই করে নিতেন সাধনার আলোকে। ফলে, কোন আগন্তুক সংস্কার তাঁর সাধনাকে হালকা

মানসিকতায় নামাতে পারতো না। সাধক রামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত অনুভব এক দিকে যেমন কার্যকারণ-নিয়ন্ত্রিত জড় রাজ্যের কোন ব্যাপার নয়, অপর দিকে তেমনি কোন মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা নয়। বিষয় ও বিষয়ী, উভয়ের কোন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অনুভব ধরা যায় না। এ-অনুভব আবার রহস্য হয়েও রহস্য নয়। রহস্য, কারণ অস্তি, নাস্তি প্রভৃতি কোন কোটি বা দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অনুভব ধরা যায় না; রহস্য নয়, কারণ পূর্বোক্ত বিষয়-বিষয়ীর অতিক্রান্তির মধ্যে এ অনুভবের আভাস পাওয়া যায়। এক কথায় এ-অনুভব হল সাত্ত্বিক মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। এই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক অনুভবের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করেন, সাধনার সাহায্যে একটির পর একটি অধ্যাত্ম স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতার স্তরে ওঠেন এবং পরিণামে সম্প্রদায়গত ধর্মাচরণের উর্ধ্বে উঠে এমন এক সম্যক দৃষ্টি বা সন্নিবেশ তিনি লাভ করেছিলেন যার ফলে যে-কোন ধর্মমতের মূলে তিনি স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারতেন। ধর্ম সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করে একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করতে পারেন, কিন্তু সাধক হিসাবে ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতে রামকৃষ্ণ যা পেয়েছেন তা কোন অধীতবিদ্যা নয়, অধীতবিদ্যার উৎস। তাই তিনি যা বলে গেছেন তা কোন শাস্ত্রবিরোধী কথা নয়, শাস্ত্রের নির্যাস। পূর্বোক্ত অনুভব-সকল তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। আচরণের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে'—এই বাক্যটির সার্থক রূপায়ণ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধক-জীবন।

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গদাধরের শুদ্ধ ভক্তি-সাধন পরবর্তী কালে দিব্যাচারী তন্ত্র সাধনার পথ খুলে দিল; বাৎসল্য, মধুর ভাব প্রভৃতি বৈষ্ণবোক্ত সাধনার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে তিনি চরম অদ্বৈত তত্ত্বে উঠলেন, সাধনার সর্ব দিক শেষ করে সিদ্ধসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতির মূলকথা নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন। ফলে, তাঁর দিব্য দৃষ্টি ধর্মবিশেষের সূত্র ধরে কোন একটি সাধনার মধ্যে সীমিত ছিল না। জীবন পণ করে যে-সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, চিত্তের বীক্ষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনে যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অভিজ্ঞ সাধকদের অনুভবের সঙ্গে তিনি যা মিলিয়ে নিয়েছিলেন, তা কেবলমাত্র ব্যক্তি-মুক্তির জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণই ছিল তার উদ্দেশ্য।

তা-ছাড়াও, রামকৃষ্ণের সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার মৌলিকতায়। আমরা পূর্বেই বলেছি তিনি কোন চলতি পথে ধর্মাচরণ

করেন নি, অনুভব ছিল তাঁর সাধনার প্রাথমিক উপাদান, যথার্থ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধির মাপকাঠি। তাঁর সাধনা যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ রাজ্যে প্রবেশ করত তিনি অন্বেষণ চালিয়ে যেতেন; অপরোক্ষ অনুভূতিতে তাঁর অন্বেষণের সমাপ্তি। ভাব-সাধনার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে তিনি উঠেছিলেন বস্তু রাজ্যের সূক্ষ্মতম স্তরে, সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শক্তি-মহিমার মূল উৎস জ্যোতি-সমুদ্র; ব্যক্তি-মুক্তির স্তর অতিক্রম করে তিনি আবির্ভূত হলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে। 'ধর্ম রাজ্যে যত মত, তত পথ'-সূত্রের আবিষ্কারক সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করলেন বাংলার (দক্ষিণেশ্বর) এক অখ্যাত জঙ্গল থেকে, সে-বাণী ধ্বনিত হল আসমুদ্রহিমাচল, বিস্তার লাভ করল ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে। তিনি আহ্বান জানালেন সমগ্র মানব সমাজকে, বিবেকানন্দর মুখ থেকে ভারতকে তিনি শোনালেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার/ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন/সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'॥

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সাধনার পরিণতি ব্যবহার-ভূমিতে নিষ্কাম কর্মে, 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবায়'। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাধন বলতে কেবলমাত্র অনুভব, অভিজ্ঞতা, অধ্যাত্ম রাজ্যে বিচরণ, দিব্য শক্তির অধিকারী হওয়া নয়। ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে লোকহিতের জন্য যে-কোন নিষ্কাম-কর্ম 'সাধন'পদবাচ্য। তাই একজন শিল্পী, বিজ্ঞানী, তত্ত্ববিদ, সমাজসেবী ও প্রেমিক, স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যেকেই এক অর্থে সাধক। অধ্যাত্ম রাজ্যে রামকৃষ্ণের চরম অনুভব 'ভাব মুখে থাক'[২০]। ব্যবহার-ভূমিতে প্রচলিত জীবে দয়ার পরিবর্তে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবার' কথা লোকগুরু রামকৃষ্ণ বললেন। এই সংক্ষিপ্ত কথাটাই স্বামী বিবেকানন্দর জীবনে এমন এক আমূল পরিবর্তন এনেছিল যে, ঐ বাক্যটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার বাস্তব রূপায়ণ করে গেছেন এই রূপায়ণের অবশ্যম্ভাবী ফল হল সমাজ-জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং সাধক রামকৃষ্ণের লোকগুরু পদে উত্তরণ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে অধিষ্ঠান।

এখানে প্রশ্ন, লোকগুরুর লক্ষণ কি? কাকে আমরা লোকগুরু বলব? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারায় বলা যায়, ক্ষুদ্র স্বার্থপর আমিটা ধ্বংস হয়ে যার মধ্যে বিরাট ভাবমুখী 'আমি' প্রকাশ পেয়েছে, দশের কল্যাণ খোঁজাই যে-'আমি'-র স্বাভাবিক বিকাশ, তার মধ্যেই লোকগুরুর লক্ষণ দেখা যায়। ঐ বিরাট ভাবমুখী 'আমি'-টার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ধর্মজিজ্ঞাসু ও সংসার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর কাছে ছুটে আসেন, যেমন বাগানে ফুল ফুটলে ভ্রমররা

স্বাভাবিকভাবেই ছুটে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের গোটা জীবনটাই দশের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। মানুষকে তিনি শিব-দৃষ্টিতে দেখতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি দিয়ে তিনি মানুষকে বিচার করতেন না। তাঁর মধ্যে এমন এক সমদর্শিতা ছিল সেখানে বিদ্বেষের কোন অবকাশ ছিল না, ঠিক যেমন মনুমেণ্টের উপরে উঠে দেখলে নীচের তিনতলা, চারতলা বাড়ী, উঁচু নীচু ও মাটির ঘাস সব এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে এমন এক ঐক্যের স্তর থেকে দেখতেন যেখানে উঁচু-নীচুর কোন ভেদ থাকে না। ঐক্যবন্ধনেই শিব, ঐক্যবোধই ভারতীয় সাধনার মূলকথা। ঐক্যের দৃষ্টিতে বৈচিত্র্য অর্থপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়।

দীর্ঘদিন ত্যাগ ও তপশ্চর্যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র অহং-বুদ্ধি একেবারে চলে যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরের জনকল্যাণ রূপ নিত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি-নাশের মত বিরাট কাজ যে তাঁর শরীর ও মনকে যন্ত্রস্বরূপ করে সাধিত হবে, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এখানে উল্লেখ্য, অতি বাল্যকাল থেকে রামকৃষ্ণের মধ্যে ক্ষুদ্র অহং-বুদ্ধি ছিল না, কারণ মানুষের ক্ষুদ্র অহং-বোধ থাকলে দেহবোধ থাকে, কিন্তু অতি বাল্যকাল থেকেই রামকৃষ্ণের দেহবোধ যে ছিল না, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। দ্বিতীয়ত, অর্থকরী বিদ্যার প্রতি যাঁর অনীহা এবং নিজের মুক্তিকেও যিনি স্বার্থপরতা ভাবতেন তাঁর কাছে ক্ষুদ্র অহং-বোধের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তৃতীয়ত, ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন যে জনহিতায় উৎসর্গীকৃত, এ-কথা তিনি তাঁর বাল্যকালেই জানতেন। পরবর্তী কালে ত্যাগ ও কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তাঁর ঐ উপলব্ধি ও সে-সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, 'গেড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে সব জলাধারে স্রোত নেই, সেখানেই দল বা নানা আগাছার উৎপত্তি হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে সাধক আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য বলে মনে করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে, সেখানেই দল, গণ্ডি, নিজস্ব সঙ্ঘ প্রভৃতির জন্ম।' তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সব সময় লক্ষ্য ছিল কালধর্ম-প্রভাবে দারা, পুত্র, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বীকার করে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে যেন বদ্ধ না করে। কারণ, ঠাকুরের দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথই ছিল অতি উচ্চস্তরের আধার যার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বিশ্বকল্যাণের কাজ হবে। নরেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, কেশব (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) একটি বিশেষ শক্তির উৎকর্ষে বিশ্বে পরিচিত হয়েছেন, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঐ ধরনের আঠারটা শক্তি পুরোমাত্রায় আছে। কেশব ও বিজয়ের (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল,

কিন্তু নরেন্দ্রর ভিতর জ্ঞান-সূর্যের উদয়ে সেখান থেকে মায়া মোহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে।

শৈশব থেকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে এমন একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায় যা স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককেই আকর্ষণ করত। দৈহিক স্পর্শের ন্যায় মানুষের ভাব সমূহও এক থেকে অন্যে ছড়িয়ে পড়ে, একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যায়। কারণ, একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ সমগ্র জগৎ বাঁধা, এটাই ভারতীয় ঋষিদের অনুভব। রামকৃষ্ণের সে-অনুভব হয়েছিল। ফলে, ঐ সময় যাঁরা রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁদের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিত, আবার কারও কারও মধ্যে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হত। অতএব, লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গুরুত্ব ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত। বাল্যকালে কামারপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ ঠাকুরের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর অভাব তাঁরা সব সময় বোধ করতেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মাভিমানী মথুর-বাবুর ঠাকুরের মধ্যে শিব-কালী দর্শন, তাঁর মনের আমূল পরিবর্তন, গুরুজ্ঞানে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গ্রহণ, প্রধান রক্ষক ও সহায়ক হিসেবে ঠাকুরের প্রতি সেবাপরায়ণতা তখনকার অনেকের কাছে এক গভীর বিস্ময়। সাধকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিক গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিলেন। মন্ত্রগুরু এক হলেও শিক্ষাগুরু একাধিক হতে পারেন। শাস্ত্রে এ ধরনের নজীর আছে। কেনারাম ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সুফী-সাধক গোবিন্দ রায় পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপথের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সব গুরুই পরবর্তী কালে তাঁর কাছ থেকে সাধনার নতুন আলো পেয়ে নিজেদের সাধনার পূর্ণতার পথে গিয়েছিলেন। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুদের মধ্যে ভৈরবী যোগেশ্বরী ও তোতাপুরী গোস্বামীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তা-ছাড়াও, রামচন্দ্র দত্ত, রাখাল, নরেন, কালী প্রভৃতি শিষ্য-ভক্তগণ রামকৃষ্ণের বাণীকে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে এনে এক নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, কেশবচন্দ্র সেন, রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঠাকুরকে তাৎকালিক শিক্ষিত সমাজের কাছে নিয়ে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ), স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল), স্বামী অভেদানন্দ (কালী) প্রভৃতি শিষ্যগণ রামকৃষ্ণ সাধনার মূল স্তম্ভ। রাখাল মহারাজের সাংগঠনিক প্রতিভা, নরেন্দ্রনাথের দৃপ্ত আহ্বান, মর্মস্পর্শী বাগ্মিতা, কালী মহারাজের

পাণ্ডিত্য ও বৈশ্লেষণিক দক্ষতা ও অন্যান্য শিষ্যদের ত্যাগ, ধৈর্য ও নিষ্ঠা সবই অসাধারণ। শিষ্য ভক্তদের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রামকৃষ্ণের অন্তঃস্থিত চুম্বক-শক্তিকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে এক নতুন প্রেরণা দেখা দিল। তা ছাড়াও, নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ গৃহী হয়েও নিরাসক্ত জীবনের এমন এক আদর্শ রেখে গেছেন যা বাংলা তথা ভারতের গার্হস্থ জীবনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পূর্বোক্ত 'শিব জ্ঞানে জীবের সেবা' ও তার উৎস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হবে। ঠাকুরের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, পুরুষকার, সত্যনিষ্ঠা ও শুদ্ধভক্তি শতগুণে বেড়ে গেল। ইংরেজী ১৮৮৪ খ্রীঃ-র কোন এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একদিন বৈষ্ণব ধর্মের মূল আচরণ সম্পর্কে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনা হচ্ছিল। বৈষ্ণবধর্মের সার ধর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন, বৈষ্ণব আচরণের মূল কথা নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পুজন। তিনি আরও বলতে লাগলেন, নাম-নামী অভেদ জেনে সর্বক্ষণ অনুরাগের সঙ্গে নাম করতে হবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভিন্ন জেনে সর্বদা ভক্তদের শ্রদ্ধা, পুজা, বন্দনা করতে হবে। কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার, এ কথা হৃদয়ে ধারণ করে 'সর্বজীবে দয়া'—এই কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন, অর্ধবাহ্যদশায় তিনি বলতে লাগলেন, 'দূর শালা! দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের কথার মর্ম ধরতে পেরেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর গুরুভাইদের বললেন, কি ছায়া-বিহীন আলো আজ ঠাকুরের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-জ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল, মধুর ভাবে ঠাকুর বললেন। অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করতে হলে সংসারধর্ম ত্যাগ করে বনে যেতে হবে, এবং স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, প্রভৃতি মনের সুকোমল বৃত্তি সকল মন থেকে চিরতরে দূর করে ফেলে দিতে হবে, এ-কথাই সাধারণত শোনা যায়। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়'—সংসারের সকল কাজে তাকে অবলম্বন করা যায়। ভারতের প্রাচীন আরণ্যক সংস্কৃতির নব রূপায়ণ হল, সন্ন্যাসী ও গৃহী, ঈশ্বর-উপলব্ধির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে প্রচলিত অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ঘুচে গিয়ে নতুন

সম্বন্ধ-সূত্র প্রতিষ্ঠিত হল। মুক্তি-পথের সন্ধান পেয়ে গৃহী-মনে নতুন জোর এল, ভারতীয় সমাজ নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত হল।

শুধু তাই নয়, ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেদিনের ঐ কথায় ভক্তি-পথেরও নতুন দিক খুলে গেল। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হলে পরাভক্তি সাধকের আয়ত্তে আসে। রাজযোগ বা কর্মযোগ নিয়ে যাঁরা সাধনার পথে এগিয়ে যান ঠাকুরের ঐ বাণী তাদেরও পথ দেখাবে। কর্ম না করে দেহী একদণ্ডও থাকতে পারে না। (নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি ক্ষেত্রেও সাধককে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করতে হয়, এবং কর্মকে সেখানে জ্ঞানের ছায়া বলা হয়েছে।) কর্মীর পক্ষে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবাই' একমাত্র ধর্ম। নরেন্দ্রনাথ সেদিন সঙ্কল্প করলেন ঈশ্বর যদি তাঁকে (নরেন্দ্রনাথকে) সুযোগ দেন তবে ঠাকুরের ঐ কথাই তিনি সর্বত্র প্রচার করবেন; পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে তিনি কর্মের মধ্য দিয়ে ঐ সেবার কথাই শোনাবেন। সাধক রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভব 'ভাব মুখে থাক'—যে সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে—ব্যবহার-ভূমিতে বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মূর্ত হল শিবজ্ঞানে জীবের সেবায়। ভারতের সমাজ-চেতনায় এক নতুন সাম্যবাদের ভিত্তিস্তর প্রতিষ্ঠিত হল। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম—এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলার পথ প্রশস্ত করল। বর্ণ-ভিত্তিক জন্মগত জাতি-ভেদের অচলায়তন ভেঙ্গে গেল। স্ব-ধর্মকে কেন্দ্র করে গুণ ও কর্ম অনুসারে মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত মানবতা-ভিত্তিক এক নতুন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সূত্র আবিষ্কৃত হল।

এখানে প্রশ্ন, বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগে অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজ-চেতনায় মানবিক মূল্যবোধের স্থান কোথায়?

উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নটির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এর সমাধান পাওয়া যায়। তা-ছাড়াও, যৌক্তিক ধারায় দ্বন্দ্বই যে অভিব্যক্তির একমাত্র নির্দেশক, এবং অভিব্যক্তি যে একমাত্র ঐতিহাসিক অনিবার্যতা-নির্দিষ্ট, সে-কথা পুরো সত্য নাও হতে পারে। ভাব-চেতনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে তথ্য ও মূল্যবোধের সমন্বয় এবং তা থেকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণা কি একেবারে অবাস্তব? বর্তমান গ্রন্থে ঐ সব বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ নেই; তবে এখানে এটুকু বলা যায় যে, মানুষের চেতনা এখনও প্রধান ভাবে দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমিত ও বদ্ধ, এবং চেতনার অভিব্যক্তির পরিণতির কথা বলবার দিন এখনও সম্ভবত আসে নি।

রামকৃষ্ণ তৎকালে স্বভাবচ্যুত ঘরছাড়া ভারতবাসীকে স্ব-ভাবে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে গেছেন, এবং বহু ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এই

প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে কোন দল করতে হয় নি। পৃথিবীর ধর্মাচার্যগণের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র তিনিই একক এক জঙ্গলে বসে এই মহান ব্রত পালন করে গেছেন। রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারকার্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—'কেশব! আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে কাউকে বড় করা যায় না। ভগবান যাঁকে বড় করেন, বনে থাকলেও সকলে তাঁকে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি সেখানে সন্ধান পেয়ে যায়।'

রামকৃষ্ণ অবতার কি অবতার নন, এ-প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে রামকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা ও লোকহিতকর কাজ জড়িত নয়। সবার উপরে রামকৃষ্ণ একজন মানুষ, 'পূর্ণ-অহন্তার' অধিকারী, অর্থাৎ একজন পরিপূর্ণ মানুষ। দৈবী করুণাকে নিজ অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে, 'বহুজনহিতায়', 'বহুজন-সুখায়,' তিনি কাজ করে গেছেন, এই মাটির পৃথিবীতে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে গেছেন। অতএব, রামকৃষ্ণ স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল, তাঁকে অবতার বললে বা না বললে রামকৃষ্ণের মহিমা ও তাঁর অভূতপূর্ব কার্যাবালী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে এতটুকু বাড়েও না, কমেও না। লৌকিক ও অলৌকিক প্রভৃতি প্রশ্ন যদি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তোলা যায় তবে এ-কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, অসীমের দৃষ্টিকোণ থেকে যা স্বাভাবিক, সসীমের দৃষ্টিকোণ থেকে তাই অস্বাভাবিক বা অলৌকিক। রামকৃষ্ণ ছিলেন অসীম লোকের মানুষ, তাই তাঁর কার্যকলাপ সসীম দৃষ্টিতে বা কার্য্য-কারণের ভাষায় সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই আমরা অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যাবলীকে অলৌকিক আখ্যা দিই। এখানে মনে রাখতে হবে রামকৃষ্ণের মধ্যে অলৌকিকতা বলে যদি কিছু থাকে তবে সে-অলৌকিকতা সৃষ্টিবহির্ভূত কোন ব্যাপার নয়।

এখানে আরও বলা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণ কোন সম্প্রদায়গত ধর্ম বা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান নয়, রামকৃষ্ণ একটি 'ফেনোমেনন', যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কোন আনুষ্ঠানিক চর্যার মাধ্যমে রামকৃষ্ণের সাধনার পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণ কোন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানগত ব্যাপার নয়। রামকৃষ্ণ একটা পরম্পরা, যে-পরম্পরার মূল উৎস ভারতীয় ঐতিহ্য ও অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিন যে-পরম্পরার সূচনা হয়েছিল, বিবেকানন্দপ্রমুখ শিষ্য-ভক্তগণ যে-ধারা সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে গেছেন, সে-পরম্পরা আজও নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত চলেছে, তার গতি ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় অভ্যুদয় (বৈষয়িক

উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স (অধ্যাত্ম মুক্তি) ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশাপাশি চলেছিল। বর্ণ-ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে একদিকে যেমন ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, ভেষজ প্রভৃতির উন্নতি হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, কামশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য-বিদ্যা প্রভৃতিরও চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল। আর নিঃশ্রেয়স বা অধ্যাত্ম মুক্তি (আত্মমুক্তিই হোক বা স্বর্গপ্রাপ্তিই হোক), ভারতীয় জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। মুনি-ঋষিদের চালিত এই দেশে কোন দিকেই কোন অভাব ছিল না। রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসন, পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন, রাজস্ব আদায় ও সে-রাজস্ব কাজে লাগান, সব কিছুই সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ছিল। সমাজপতিরা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, খেয়াল-খুসীমত কোন বিধান দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। নিস্পৃহ মুনি-ঋষিদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন এবং সেই অনুসারে বিধান দিতেন। রাষ্ট্রনীতি কখনও ভারতীয় সমাজকে উপেক্ষা করে চলতে পারে নি। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরম্পরার ইতিহাস ; ব্যক্তি সেখানে কখনও বড় হয়ে দেখা দেয়নি, সেখানে সবই নীতি-নির্দিষ্ট ও আদর্শ-নির্ধারিত। ভারতবর্ষ কখনই উদ্দেশ্যবিহীন 'রোমান্টি-সিসম'-র প্রশ্রয় দেয়নি। নিকষ জ্ঞানের জন্য জ্ঞান ভারতীয়তার কথা নয়। জ্ঞান, মুক্তি, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি সমার্থ-বোধক শব্দ। ভারতবর্ষে জ্ঞান হয় মুক্তির নির্দেশক, না-হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজ-কল্যাণের (বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়) পথ-প্রদর্শক। তাই সম্ভবত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ষই তার দীর্ঘ একটানা পাঁচ হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরম্পরা দাবি করতে পারে।

পরবর্তী অধ্যায়ে তাৎকালিক ভারতীয় সমাজ-চেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে আলোচনা হবে।

রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা

লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস



স্বামী বিবেকানন্দ

তৃতীয় অধ্যায়

সে প্রায় ১৪২/১৪৩ বছর আগের কথা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তাঁর জন্ম হয় গ্রাম-বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে। গ্রামের জল, বায়ু, মাটি, এক কথায় গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গ্রামের মানুষদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তাদের জীবনধারা, বিশ্বাস ও মানসিকতা অতি বাল্যকালেই তিনি অনুভব করেছিলেন। গ্রামের আপন-ভোলা এই বিবাগী ছেলেটি যৌবনে পা দিয়েই কলকাতায় এলেন এবং সেখানে এক নতুন জীবন-অভিজ্ঞতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এক অদৃষ্ট শক্তির অমোঘ প্রভাব তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এল, অল্প দিনের মধ্যে সেখানে তিনি মা ভবতারিণীর পুজক নিযুক্ত হলেন। এ-সব কথা আমরা আগেই বলেছি। পূর্ণ অধ্যাত্ম-সাধক হিসাবে ধর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন বাঙালীর শৈবালাচ্ছন্ন জীবনস্রোতে এক নতুন প্রবাহ আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে নবচেতনার শক্তি-বীজ জনমানসে অঙ্কুরিত হয়, কালে বিস্তার লাভ করে সেই বীজ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে। সমগ্র ভারত তথা বিশ্বে রামকৃষ্ণ আজ একটা অধ্যাত্ম প্রতীক, বিরাট শক্তির উৎসস্থল, যে-উৎস থেকে মানুষ লাভ করতে পারে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও প্রেমের পথ ; জীবনসংগ্রামে ক্লিষ্ট মানুষ ঐ নাম স্মরণে উদ্বুদ্ধ হয় এক নব প্রেরণায়, তারা আস্বাদন করে এক সঞ্জীবনী শক্তি-চেতনা।

প্রশ্ন, রামকৃষ্ণের এই পৃথিবীতে আগমনের হেতু কি কার্যকারণ-নিয়ন্ত্রিত ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, না অহেতুক দৈবী করুণা, না উভয়ের মিলিত ফল। ঐ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না করে এখানে এটুকু বলা যায় যে, ঐ সময় সমাজ-কল্যাণের পক্ষে রামকৃষ্ণের ন্যায় একজন অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের অবশ্য প্রয়োজন ছিল ; এবং অপর দিক থেকে, চিরায়ত ভারততীর্থের আধ্যাত্মিক ও ধর্মতত্ত্বের মূল্যায়ন এবং ঐ তত্ত্ব জীবনে কার্যকর করার জন্য একজন লোকোত্তর প্রতিভাবান পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব কার্যাবলী ঐ দুই দিকেই আলোক-পাত করে গেছে, আজ সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমসাময়িক উনিশ শতকের নবজাগরণ বা রেনেসাঁ ও তার পটভূমি তাৎকালিক কলকাতার সমাজ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে কিছু আলোচনা হবে। এই আলোচনা হবে সমাজ তথা মানবতা-ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কারণ সমাজ হল ভারতীয় ধর্মচেতনার ফলশ্রুতি এবং ধর্মকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষে এক দিকে যেমন অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থ সকল

পরম চরিতার্থতা লাভ করে (অর্থাৎ ধর্মের আলোকে সমাজ সুসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে), অপর দিকে আবার ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ খুঁজে পায় তার জীবনের পরম পুরুষার্থ মোক্ষের নির্দেশ।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমাদের মধ্যে আসেন ১৮৬৩ সালে, এবং দেহ রাখেন ১৯০২ সালে। যৌবনে তিনি রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ-আকর্ষণ কোন মানসিক ভাবগত ব্যাপার নয়, এ-আকর্ষণ প্রারব্ধজাত আত্মিক যোগসূত্র। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম যখন নরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয় শ্রীরামচন্দ্র দত্তর কাছ থেকে দক্ষিণেশ্বরের 'পরমহংস'র কথা শোনেন, তিনি তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন এবং না দেখেই তাঁর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন। নরেন্দ্রনাথ তখন হার্বার্ট স্পেনসার, মিল, বেন্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে স্মর্তব্য, বিবেকানন্দর অদ্বৈত-চিন্তা রামকৃষ্ণ-ভাবনার প্রতিধ্বনি, কারণ বিবেকানন্দর জীবন-জিজ্ঞাসার মূলসূত্রের সবটাই তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি সেই তত্ত্বই পেয়েছিলেন যা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বলা আছে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে রামকৃষ্ণের ভাব সম্পর্কে বিবেকানন্দর অনুভূতি হল, 'এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাঁর জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত বহু হইতে মনের গতি একের দিকে ঝুঁকিতেছে। সময় সময় শোনা যাইত সমাধিলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ, তাঁহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যেকেই দিব্য দর্শন লাভ করিত। যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই'।

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ-ভাবনার উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইরা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন। গৃহী ভক্তদের অবদানও সে-ক্ষেত্রে কম নয়। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিগত অনুভব, তথা বিবেকানন্দর জীবন-দর্শন, সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা হবে।

অবশেষে প্রশ্ন, রামকৃষ্ণের কথা ও আচরণ কি তৎকালীন সমাজ-চেতনা ও তার সংস্কারের মধ্যে বদ্ধ? না, ঐ সকল কথার কোন শাশ্বত মূল্য আছে, যা দেশ-কালের সীমারেখার ঊর্ধ্বে এবং ভবিষ্যৎ সমাজের নিয়ামক বিধি-নিষেধ হিসাবে কার্যকর হওয়ার সামর্থ্য রাখে। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-কথা কি সীমিত মানব-চেতনার কথা, না ঐ কথা সর্ব কালের, সর্ব দেশের জিজ্ঞাসু মানুষের প্রেরণার উৎস? ফলকথা, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সাধনার

বাস্তব মূল্য ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তৎকালে বিশেষভাবে স্ফুট হয়। তাই বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত হবে পুর্বোক্ত তাৎকালিক কলকাতার সমাজ, সমসাময়িক উনিশ শতকের নবজাগরণ ও তার মূল্যায়ন, রামকৃষ্ণ সাধনার উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দর জীবন-দর্শন, রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শিষ্যদের পরিচয় এবং পরিণামে রামকৃষ্ণের কথা কি সমকালীন সমাজ ও সংস্কারে বদ্ধ, না রামকৃষ্ণের কথা সর্বকালীন ও সর্বজনীন ?

ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী ছেড়ে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে এলেন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালে বৃহত্তর বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা নগরী। কলকাতার প্রায় চার-পাঁচ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে বৃক্ষাদি-শোভিত দক্ষিণেশ্বরের জঙ্গল, অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষ উপযোগী স্থান। তখনকার কলকাতার সামাজিক পরিবেশ ও মানসিকতা সম্পর্কে এখানে একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ; লক্ষ্য, যে-পরিবেশে রামকৃষ্ণকে সমাজ-সংস্কারের কাজ করতে হয়েছিল তার একটা পরিচয় দেওয়া। বর্ণনাটি দিয়েছেন বিবেকানন্দর মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' গ্রন্থে। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় তিনি যা পেয়েছেন তাই তিনি লিখেছেন।

সমাজে তখন নীতিবোধ বলে কিছু ছিল না, চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা ও নাস্তিকতার ভাব পুরোমাত্রায় দেখা দিয়েছিল। 'মিথ্যাচরণ, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, বিধবাকে ঠকান ছিল বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক.........।'

"লোক মরিলে কেহ তাহাকে দাহ করিতে যাইত না......। বাড়ীর পাশে লোক মরিলে মড়া উঠিত না। এমন কি জ্ঞাতি মরিলেও সহজে কেহ সঙ্গে যাইত না।"

"মেয়েদের আট বৎসর হইতে নয় বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইত, ছেলেদেরও বিবাহ হওয়া চাই-ই। ষোল, সতের বৎসরের ছেলে বিবাহ না করিলে জাত যাইবে, এমন কি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে।"

"বংশ ও জাত সম্পর্কে অতি কঠোর নিয়ম ছিল। নিমন্ত্রণ ও আহার সম্পর্কে ঘোর সমস্যা ছিল।"

"ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কখনও ভাগবতের কথা শুনিতে যাইতেন না, ইহাতে তাহার মানহানি হইত। গোসাঁইর সহিত কোন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ এক পংক্তিতে আহার করিতেন না। কোন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে গোসাঁইর সহিত এক আসনে বসিতেন না। গোঁড়া বৈষ্ণবরা দুর্গা ঠাকুরকে বলিতেন 'হাতি-মুখোর মা', বেল পাতাকে বলিতেন 'তেফের কা পাতা' কালী ঠাকুরকে বলিতেন, 'মসী'।"

"বাংলায় চিঠি লেখা অতি অসভ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত। দীনবন্ধু

মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা'-তে তাৎকালিক কলিকাতার সমাজের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।"

"প্রণাম ছিল কুসংস্কারের বিষয়, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ইহার কোন দরকার নাই। দেব-দেবীর পূজাও যেন অতীব গর্হিত কার্য্য। ঠাকুর দেবতার কথা শুনাও ছিল কুসংস্কার।"

"হিন্দুধর্ম কি তাহা অনেকেই বুঝিত না। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কাহারও কোন পড়াশুনা ছিল না, এবং হিন্দুধর্মের কোন গ্রন্থ তখন পাওয়া যাইত না।" মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফলে বলেছেন, "শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ম আমরা কিছুই জানিতাম না। গীতা ও উপনিষদের নাম কেহ শুনে নাই। চণ্ডীপাঠ মাত্র ক-একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ করিতেন। ত্রৈলক্য সান্যাল মহাশয় চৈতন্যের বিষয় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আমরা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রথম এই গ্রন্থ পাঠ করি। 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামে যে গ্রন্থ আছে এ বিষয় তখন আমরা কিছুই জানিতাম না।"

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে কলকাতার বাঙালী সমাজ তখন এক চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছিল এবং ঐ সমাজ সংস্কারের জন্য তখন রামকৃষ্ণের মত একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অবশ্য প্রয়োজন ছিল। (রেনেসাঁর পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-সম্প্রদায়ের আলোচনা দ্রঃ।)

কেশবচন্দ্র সেন (ব্রহ্মানন্দ) মহাশয়ের বক্তৃতা থেকে লোকে জানল যে, দক্ষিণেশ্বরে 'পরমহংস' নামে পরিচিত এক সাধক আছেন। তিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকে খুব উচ্চ অবস্থার লোক, বালক-স্বভাব, অতি সাধু ও অমায়িক।

১৮৮২-৮৬ সালে রামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে সিমলায় (উত্তর কলিকাতা) রামচন্দ্র দত্তর[২১] বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন। রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন পরমহংস মশাই-র প্রথম দিকের একজন পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের নাম ও ভাব প্রচারের এক মুখপাত্র বিশেষ। ঐ সময় একটা কথা উঠেছিল, রামকৃষ্ণদেবের অতি উচ্চ অধ্যাত্ম ভাব কি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা ঠিক? সাধারণ লোক ঐ সব উচ্চ ভাব কি নিতে পারবে? রামচন্দ্র দত্ত কারও কোন কথা না শুনে অনেককে রামকৃষ্ণদেবের সর্বব্যাপী ভাবের কথা বলতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা আরম্ভ করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উত্তর কলকাতার কিছু লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে রামচন্দ্র দত্তর মানসিকতা এক বিশেষ অধ্যাত্ম ধারায় বইতে লাগল। গুরুজ্ঞানে রামকৃষ্ণকে তিনি হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গুরুর প্রতি অব্যভিচারী ভক্তি মনের শোক-তাপ দূর করে তাকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলল।

রামচন্দ্র দত্তর বাড়ীতে মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। রামকৃষ্ণের বহিরাঙ্গিক অবয়ব ও ভাবভঙ্গী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,—"লোকটির চেহারাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মত; বর্ণ খুব কালো নয়, তবে কলকাতার সাধারণ লোকের চাইতে কিছু মলিন। গালে একটু একটু দাড়ি আছে, কপচানো দাড়ি। চোখ দুটি ছোট যাকে বলে 'হাতি চোখ'। চোখের পাতা অনবরত মিট মিট করিতেছে, যেন অধিক পরিমাণে চোখ নড়িতেছে। ঠোঁট দুটি পাতলা নয়, নীচুকার ঠোঁট একটু পুরু। ঠোঁট দুটির মধ্য হইতে দাঁতের সারির মাঝের কয়েকটি দাঁত একটু বাহির হইয়া আসিয়াছে। গায়ে জামা ছিল; তাহার আস্তিনটা কনুই ও কব্জির মাঝ বরাবর আসিয়াছে। কথাবার্তার ভাষা কলকাতার শিক্ষিত লোকের ভাষার মত নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমন কি কলকাতা সহরের রুচি-বিগর্হিত। কথাগুলি একটু তোতলার মত। রাঢ়দেশীয় লোকের মত উচ্চারণ; 'ন'-এর জায়গায় 'ল'।"

কিন্তু বাইরের অবয়ব যাই হোক না কেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে এমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যা মানুষের মনকে স্বতস্ফূর্ত তাঁর দিকে আকৃষ্ট করত। শোনা যায়, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি লোকোত্তর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ ধরণের শক্তি ছিল। তাছাড়াও, শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের প্রভাব এত বেশী সক্রিয় ছিল যে, যাঁরাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মুহূর্তের জন্য হলেও তাদের প্রায় সকলেরই দেহবোধ থাকত না। তাঁর কাছে চুপ করে বসে থাকতে লোক ভালবাসত। বৌদ্ধগ্রন্থে সম্ভবত এই অবস্থাকে 'আনন্দময় লোকে' অবস্থান বলা হয়েছে। ইহা ভাবলোক ও জ্ঞানলোকে অবস্থানের বহু ঊর্ধ্বে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলে যে-কোন ক্লিষ্ট লোক অনাবিল শান্তি লাভ করত। রামকৃষ্ণের মধ্যে মাঝে মাঝে শক্তির আন্তর প্রবেশ ও অশরীরী ভাব দেখা যেত। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বাহ্যাবস্থা লোপ পেত।

আমরা পূর্বেই বলেছি কলকাতা ছিল তখন বৃহত্তর বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানকার অন্ধ অনুকরণপ্রিয় ইংরেজী-ভাবাপন্ন বিকৃত সমাজকে রামকৃষ্ণ কী ভাবে ভারতীয় ভাবধারায় রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা সত্যই বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণ প্রকৃত সহানুভূতি ও ভালবাসা দিয়ে তাৎকালিক সমাজে এমন এক ধর্মাশ্রিত নতুন

চেতনা এনেছিলেন এবং সেটা এত গভীর ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাপুর্ণ ছিল যে তখন অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি। অপরে যুক্তি দেখিয়ে, তর্ক করে, বক্তৃতা দিয়ে যে-সকল কদাচার, কুৎসিত ব্যবহার, কুসংস্কার প্রভৃতি পাল্টাতে পারেন নি, পরমহংসদেব নিজে আচরণ করে, নিজের প্রভাব বিস্তার করে, তা অনেক পরিমাণে শোধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন; অথচ যাঁরা গোঁড়া বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও ঠাকুরের আচরণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করেন নি।

রামকৃষ্ণকে রামচন্দ্র দত্ত প্রথম যখন তাঁর সিমলার বাড়ীতে আনেন তখন ঐ অঞ্চলের অনেকেই রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মশক্তি সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন না। তার কারণ, ধর্মের প্রতি তখনকার লোকদের একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। রামকৃষ্ণের প্রতি রামচন্দ্র দত্তর আনুগত্যের জন্য তাঁকে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। রামচন্দ্র দত্ত ঐ সব বিদ্রূপ গ্রাহ্য না করে বাড়ীতে পুজা, অর্চনা ও উৎসবাদির আয়োজন করতেন। তা ছাড়াও, রামচন্দ্র দত্ত তাঁর পরিচিত লোকদের বাড়ীতে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের অলৌকিক ভাব ও শক্তির কথা বলতেন, এবং যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করতেন, এ কথা আমরা পুর্বেই বলেছি।

ঐ সময় রামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে যান, রাজমোহন বসুর বাড়ীতে মাঘোৎসবে যোগদান করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে তখন প্রধান ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ (নাগ মহাশয়), ডাঃ বিহারী ভাদুড়ী, শ্রীযোগেন চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র মিত্তির, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমহেন্দ্র গোসাঁই ইত্যাদি আরও অনেকে।

এখানে উল্লেখ্য, প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের 'আশার দল'-এ (Band of Hope) যোগদান করেন। পরে রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবন-ভাবনার আমুল পরিবর্তন হয়। ঐ সময় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশ চন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আরও অনেকে। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাতের পর সাধারণ সমাজের অনেকেই তাঁর কাছে যেতেন। সাধারণ সমাজের প্রধানদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এখানে বলা যায়, তখনকার কলকাতা সমাজের কিছু লোকের মধ্যে আপাত-খ্রীস্টান-বিরোধী একটা প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে ঠিক, কিন্তু সে-প্রতিবাদের মুল ধারা তখনও অনিশ্চিত। একদিকে, নিরাকার ব্রহ্ম কি তার

কোন সঠিক সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি, ফলে সাধারণ লোক তা কিছু বুঝত না, অপর দিকে, পুরোনো আচার-ব্যবহার, ঠাকুর-দেবতা, পুজা-অর্চনার মূল্য তারা ঠিক জানত না। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও নাস্তিকতার ভাব সাধারণ মানসিকতাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ কথারও আভাস আমরা পুর্বেই দিয়েছি।

এমন-ই এক অনিশ্চিত অবস্থায় ভারতের মর্মকথাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ উদ্‌ঘাটিত করলেন জনসমাজের কাছে এবং লোকের মনে একটা সাড়া জাগল। তৎকালে ভক্তি-মার্গের লোকেরা রামকৃষ্ণকে মহাভক্ত বলতে লাগলেন। জ্ঞান-মার্গের লোকেরা তাঁকে মহা-জ্ঞানী বলতেন, দার্শনিকগণ তাঁকে দর্শনের প্রতিমূর্তি মনে করতেন, বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে বিজ্ঞানের প্রমাণ-পুরুষ হিসাবে দেখতেন।

জনসাধারণ-স্বীকৃত বহু-ঈশ্বরবাদ রামকৃষ্ণ সহানুভূতির চোখে দেখতেন এবং অতি বিনতভাবে দার্শনিকদিগের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতেন, এবং প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা তাঁর মতে ছিল আর্ত মানুষের সেবা।

রামকৃষ্ণের মতে জাতিভেদ দূর করবার একটা বড় পথ হল ঈশ্বর-বিশ্বাস ও জীবে প্রেম। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কোন জাত-বিচার[২২] থাকতে পারে না। ঐ কালে জাতি-বিচার ও ছুঁৎ-মার্গ যখন চরম পর্যায়ে উঠেছিল, ঠাকুরের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ দত্তর বাড়ীতে বিনা নিমন্ত্রণে তখন নানা জাতের লোক একত্রে আহার করত।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হবে যা-থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে রামকৃষ্ণের মনোভাবের একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। ঐ ঘটনাটি তৎকালে বহু লোককে ভাবিত করেছিল। বক্তা হিসাবে কেশবচন্দ্র সেনের তখন বিশেষ সুনাম ছিল। পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও হিন্দুধর্ম অপপ্রচার রোখবার জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে টাউন হলে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন. একদিন তিনি সদলবলে বোটে করে দক্ষিণেশ্বর যান এবং গঙ্গার ধারে বক্তৃতা করেন। সেদিনের বক্তৃতার শ্রোতাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ একজন ছিলেন। বক্তৃতা শুনতে শুনতে হঠাৎ তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। কেশব সেন মশাই সেটা লক্ষ্য করলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মশাই, কি ক্রটী হয়েছে"? পরমহংস মশাই উত্তরে বললেন, "কেশব, তুমি বললে, ভগবান তুমি সমীরণ দিয়েছ, তরুগুল্ম দিয়েছ, এ সকল ত বিভূতির কথা। এ সকল নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? যদি এ সব তিনি নাই দিতেন, তা হলে কি তিনি ভগবান হতেন না? বড় মানুষ হলে কি তাঁকে বাপ বলবে,

তিনি যদি গরীব হতেন তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?…এ সব বস্তু ও গুণের কথা, ঐশ্বর্য্য ও বিভূতির অতীত হলেন ব্রহ্ম"।

এ-আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-বোধ ও অদ্বৈত-উপলব্ধি কত গভীর ছিল। তার কারণ, সম্ভবত রামকৃষ্ণের অদ্বৈত-বোধ উপলব্ধিগত ও অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত; এবং যে-জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং যে-জ্ঞান উপলব্ধিগত, উভয়ের মধ্যে অবশ্যই গুণগত পার্থক্য থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত-বোধ[২৩] প্রাক্তন বা শুদ্ধ সংস্কার-জাত (যদিও অদ্বৈত-স্তরে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কোন সংস্কারই থাকে না); এ-জীবনে যথারীতি অভ্যাস করে, আচরণের মাধ্যমে যাচাই করে, তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে এ-জগতের মধ্যে থেকেও এ-জগতের উর্ধ্বে ছিলেন, সে কথা অতি শৈশব থেকেই তাঁর আচরণে ধরা পড়ে। (প্রথম অধ্যায় দ্র:।)

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের ঐ আলোচনার কথা সে-দিন সিমলা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ লোকের মনে রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে এক গভীর রেখাপাত করে।

এখানে উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। পূর্বেই ঐ রেনেসাঁর পটভূমি হিসাবে তাৎকালিক সবে-ইংরেজী-জানা কলকাতার সমাজ ও তার মানসিকতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা'য় এ-আলোচনার উদ্দেশ্য, রামকৃষ্ণ যে ঐ সময় কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনধারা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সাধারণ লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা দেখান। নানা প্রসঙ্গে উপদেশচ্ছলে, গল্পাকারে, যে-সব কথা[২৪] তিনি বলে গেছেন তা মানব-চেতনার ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা-ছাড়াও, 'রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা'র পরিণতি এক দিকে যেমন মানুষের মনে অধ্যাত্ম-উন্মেষ ও সনাতন ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীর অতি সহজ ও সরল ভাষায় নব রূপায়ণ, অন্য দিকে তেমনি 'বহুজনহিতায়' নিঃস্বার্থ কর্মযজ্ঞের নির্দেশ। অতএব, রামকৃষ্ণ-সাধনার একটা বড় দিক হল তাৎকালিক সমাজের উন্নয়ন ও তার নব মূল্যায়ণ, যে-কাজ সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইগণ ও অন্যান্য গৃহী ভক্তরা করে গেছেন। প্রাচীন ভারত ও নব্য ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে স্বামী বিবেকানন্দ এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। রামকৃষ্ণের অনুভব সকল স্ফুট হয়েছিল বিবেকানন্দের চিন্তায়, বিভিন্ন রচনায়[২৫] ও কর্মে।

প্রশ্ন—বহুল প্রচারিত উনিশ শতকের (১৮৬০—?) নবজাগরণ বা রেনেসাঁ বাংলা তথা ভারতের পক্ষে সত্যই কি ভারতীয় চেতনার

পুনরভ্যুত্থান, না সামরিক পরাভবের ন্যায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজের কাছে এক চরম পরাভব? সার্থক রেনেসাঁর মূল লক্ষণ হল আত্মপ্রত্যয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভারতীয়তার প্রতিষ্ঠা), যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক জীবনে দেখা দেয় স্বধর্ম সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা, প্রত্যয়, নতুন দৃষ্টি, নতুন চেতনা ইত্যাদি। ঐ আত্মপ্রত্যয় বা ভারতীয়তা-বোধ এ-দেশের সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সত্যই কি সেদিন এসেছিল? দীর্ঘদিন পরাধীনতাজনিত আত্মবিস্মৃত ভারতীয়রা কি স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল?

উত্তর—সম্ভবত 'না'।

ইংরেজী-জানা কিছু-সংখ্যক শহুরে লোকের মনে সামান্য একটু আত্মজিজ্ঞাসার ছোঁয়াচ লাগলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় জনমানসে সে-জাগরণের কোন প্রভাব দেখা দেয় নি। অন্যভাবে বলা যায়, মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শহরবাসীর একটা বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের অসহযোগের ফলে এদেশে সেদিন যে রেনেসাঁর হাওয়া বয়েছিল তা অনেকটা হাল্কা ধরনের ব্যাপার। তা-ছাড়াও, আন্তর ও বাইরের জীবন, এই উভয়ের মধ্যে সেদিন ছিল একটা বড় ধরনের বিষমতা ও বৈপরীত্য। ফলে, রেনেসাঁর অন্ত্যফল হিসাবে যে চারিত্রিক সংহতি গড়ে ওঠে তা সাধারণ ভারতীয়দের চরিত্রে দেখা দেয়নি। তবে, সর্বদেশে সর্বকালে যেমন কিছু-সংখ্যক মহৎ ব্যক্তি থাকেন, ভারতবর্ষেও সেদিন তেমনি ছিল।

ভারতীয় চেতনা ও মূল্যবোধের উৎস হল মুনি-ঋষিদের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি; আর পাশ্চাত্ত্য চিন্তা—বর্তমান ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি-র কেন্দ্র হল গ্রেকো-রোমান সভ্যতা। ভাবগত দিক থেকে এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ সে-দিনের নব-চেতনা-উন্মেষের পক্ষে একটা বড় বাধা ছিল।

পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হল গ্রীস। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মূল কেন্দ্র হল গ্রেকো-রোমান সভ্যতা। সক্রেতিসের ভাস্বর প্রজ্ঞা, প্লাতো-আরিস্ততলের বলিষ্ঠ দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ, শিল্প, সাহিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষ এবং রোমীয় আইন ও ন্যায়পরায়ণতা আজও বিশ্ব-সংস্কৃতির সম্পদ। কিন্তু ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষে ঐ ধরনের রেনেসাঁ সম্ভব নয়; কারণ, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে এমন এক সংরক্ষণশীল মমতা ও মর্য্যাদা-বোধ ভারতীয়দের সহজাত, যার ফলে গ্রেকো-রোমান সভ্যতার ঐতিহ্যধারী নবাগত ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সে কখনও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলেই নব যুগের ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাবাপন্ন কিছু

কিছু ভারতীয় হয়ে উঠলেন না-ভারতীয় না-য়ুরোপীয়। অতএব, জীবন (মাটির প্রভাব) ও জীবন-দর্শন (জীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্য বোধ)—উভয়ের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর অসহযোগ সেদিনের রেনেসাঁর অকৃতকার্যতার আর একটা বড় কারণ।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সূত্রপাতে লর্ড মেকলে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে আমরা এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরী করব, যারা কেবল জন্মগত সূত্রে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু চিন্তা, কর্ম ও বাক্যে য়ুরোপীয়ান হবে।[২৬]

মেকলের এই প্রয়াস সেদিনের শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টায় অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছিল। কারণ, সেদিন শহরের পুর্বোক্ত কম-বেশী ইংরেজী-জানা শিক্ষিত সমাজে সাহেব হওয়ার এক উদগ্র মোহ পেয়ে বসেছিল, সেদিনের বিভ্রান্ত ভারতীয়দের মন থেকে ভারতের মাটি, মৌলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব একেবারে চলে গিয়েছিল।

এতৎসত্ত্বেও তাৎকালিক পূর্বোক্ত সমাজচেতনার পটভূমিতে রেনেসাঁর অবদান একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভারত-আত্মার তথা জনজাগরণের দিক থেকে রেনেসাঁর খুব একটা বড় মূল্য না থাকলেও ঐ সময় ভারতীয় জীবনের একটা দিক খুলে গিয়েছিল। মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ দুর্বল ও পঙ্গু বলে মনে হওয়ায় তার কাঠামো নতুন করে সাজানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যাব ফলে মানবতার নব মূল্যায়নের পথ সুগম হয়। দরিদ্র, অনুন্নত, অবজ্ঞাত সমাজ মানব-অধিকারের সম্মান ও স্বীকৃতি পেল। অন্য দিকে, নারী-সমাজ লাভ করল অনেকখানি মুক্তি ও অগ্রগতি। এখানে নরেন্দ্রনাথ দত্তর (স্বামী বিবেকানন্দ) অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য (পরে দ্রঃ)। তা ছাড়াও ভারতীয় ধর্মরাজ্যে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন (পরে আলোচিত হবে) মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিত করবার প্রচেষ্টাকে অনেকখানি প্রতিরোধ করল।

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা অনুসরণ করে আমাদের প্রশ্ন—উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ থেকে মানসিক স্তরে তা হলে আমরা কী পেয়েছি? ঐ রেনেসাঁ আমাদের জীবনে কি এমন কোন মূল্যবোধ (মানস সম্পদ) এনেছে যাতে আমাদের কাছে সভ্যতার নিত্যকালের রূপ স্পষ্ট হয়েছে? অথবা, ক্রমাগত অহেতুক বস্তুসম্ভারের প্রাবল্যে আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে? আমাদের জীবনের মৌল ভিত্তি নড়ে গিয়েছে; এবং তার ফলে সংস্কৃতি ও সভ্যতা—উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতি হল প্রাণশক্তির মূল উৎস, আর শিক্ষা ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়

মানস শক্তির সাহায্যে। তাই প্রাণ ও মনের অসঙ্গতির ফলে আমাদের চিন্তা ও আচরণের মধ্যে কোন মিল নেই। তাই আজ আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয়িষ্ণু, বুদ্ধি সন্দেহাত্মক। আমরা আত্মপ্রতারণায় ভুগছি এবং নিজেই নিজের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আজ যদি ভারতীয় ঐতিহ্যকে জীবনের অঙ্গাঙ্গী করে নিতে হয়, তাহলে আমাদের প্রাণশক্তির উৎসের সন্ধান একান্ত আবশ্যক। যদি প্রয়োজন হয় তবে উনিশ শতকের মূল্যবোধের প্রতি আমাদের মনোভাব অনেকখানি পরিবর্তন বা শোধন করে নিতে হবে। প্রকৃত ভারতীয়তা উন্মেষের পক্ষে রেনেসাঁর মানস সম্পদ যদি অসম্পূর্ণ বা অসমর্থ হয় তা হলে তার অনেকখানি বর্জন করতে হবে। কারণ, ভারতীয় ঐতিহ্যের নব-রূপায়ণ ও ভারতীয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জীবনীশক্তির স্ফূরণ অনেকখানি নিহিত।

পরিবর্তনশীলতা কালের ধর্ম; যে-ক্ষণ চলে যায় সে-ক্ষণ আর ফিরে আসে না। ইতিহাসের পুনরাবর্তন দেখা দেয় পুরাতনকে নব মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে। আজ এই বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী যুগে ভারতীয় জীবন-বেদের নতুন করে মূল্যায়নের দিন এসেছে। ভারতীয় পরা-বিজ্ঞান ও নৈতিক ভাবধারা যদি আজ আমাদের জীবনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সমাজ-কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার-ভূমিতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকে কাজে লাগানর পক্ষে কোন বাধা নেই। অর্থাৎ, পরা-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক ফলিত-বিজ্ঞান মানব কল্যাণের দিক থেকে একটি অপরটির পরিপূরক। মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও মানবিক কল্যাণের দিক বাদ দিলে উভয়ের কোনটিরই কোন মূল্য নেই। উভয়েরই তখন বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভারতবর্ষে অভ্যুদয়ের কথা না বলে দীর্ঘদিন যান্ত্রিক ভাবে নিঃশ্রেয়সের (অধ্যাত্ম মুক্তি) উপর জোর দেওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজ ব্যবহারিক দিক থেকে অনেকখানি বিকলাঙ্গ ও কমজোরী হয়ে পড়েছিল; আবার আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে হিরোসিমা ও নাগাসাকির বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত হল। কিন্তু এখানে পরা-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান, উভয়ের কোনটিরই কোন দোষ নেই; দোষ একমাত্র ব্যবহারের এবং যে বা যারা ব্যবহার করে তাদের মানসিকতার। ফলে, নীতিশিক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ আজকের দিনে মানুষের জীবনে একটা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন—কমপক্ষে হাজার পাঁচেক বছরের একটানা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস থেকে পূর্বোক্ত উনিশ শতকের তথা-কথিত নবজাগরণ বা রেনেসাঁর কথা বাদ দিলে আমাদের চলার পথ কী হবে?

চীন ছাড়া এমন ঐতিহ্যবাহী জাতির ইতিহাস সম্ভবতঃ পৃথিবীতে আর নেই। মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের মৌল সংস্কৃতি আজ লুপ্তপ্রায়।

"য়্যুরোপ বর্বরদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এবং বর্বর যুগের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির পর ক্রমে ক্রমে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে, তার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে"। খুব বেশী হলেও এ-সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভবত অবিচ্ছিন্ন ছ'শো বছরের এবং এর প্রভূত বিস্তারের কথা তিনশো বছরের বেশী নয়। সে-সভ্যতাও আজ ক্ষয়িষ্ণু; কারণ, আধ্যাত্মিক উপাত্ত (content) ছাড়া কোন সভ্যতাই কোন দিন স্থায়ী হতে পারে না। য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে কার্য-কারণ তত্ত্বকে বাদ দিলে পড়ে থাকে কতকগুলি সাংবেদনিক ছাপ বা টুকরো-টুকরো কতকগুলি ঘটনা; তার সংযোগের ফলে স্বল্পকালগত খণ্ড অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। আবার অধ্যাত্ম উপাত্ত ছাড়া যৌক্তিক মূল সূত্রাবলীর ব্যাখ্যা পরিণামে অবাস্তব হতে বাধ্য। অতএব, 'স্পিরিচুয়াল কনটেণ্ট' ছাড়া 'ম্যাটার'-কে উপাত্ত হিসাবে গ্রহণ করে কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল অভিজ্ঞতা থেকে যে-সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে ওঠে তা কখনও দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। তাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ক্ষণভঙ্গুরতার প্রতি ও-দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আজ নজর পড়েছে এবং চলতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে আজ নতুন ভাবে চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। "সাহিত্যিকরা আজ 'Fragmented Self'-র কথা বলছেন, নীতিবিদ্‌রা প্রশ্ন তুলেছেন, য়্যুরোপে গ্রেকো-রোমান সভ্যতার যদি কোন সার্থক বিকাশ হয়ে থাকে, তা হলে পর পর দুটো বর্বরতম যুদ্ধ এবং ততোধিক বর্বরতর হত্যাকাণ্ড সম্ভব হল কী করে? পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পদার্থ-বিজ্ঞানের মৌল সূত্র সকলের সংস্কার করে বিজ্ঞানের এক নতুন কাঠামো তৈরীর চেষ্টা করছেন—অর্থাৎ সমগ্র য়্যুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিমূল আজ নড়ে উঠেছে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখনও আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি য়্যুরোপীয় ধারার অনুকরণে। আমরা অনুকরণ বর্জন করে আমাদের প্রতিটি সমস্যাকে যদি ব্যক্তিগত, জাতিগত ও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি ও সমাধান করবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের সমাধানও সভ্যতার বিকাশে অবশ্যই সহায়ক হবে।

ভাবগত দিক ছাড়াও, ইংরেজ আমলে তাদের বস্তু-সমৃদ্ধ জীবন-মান আমাদের আকৃষ্ট করে, আমাদের অনুকরণপ্রিয়তা ঐ ভাব গ্রহণে সহায়ক হয় ও দেশের বস্তু-সমৃদ্ধ জীবন-মান আমাদের দেশীয় জীবনযাত্রায় নানা উপকরণ এনে দিল; ফলে, ঐ বস্তু-সমৃদ্ধির প্রভাবের মধ্যে আমরা ডুবে গেলাম, আমরা ভুলে গেলাম, দেহ ও মনের সম্বন্ধের মত বস্তুগ্রহণ ও বস্তু-

আশ্রিত ভাবের একটা সম্বন্ধ আছে। ফলে, আন্তর জীবনেও আমরা ক্রমশ বস্তুভাবাপন্ন হয়ে পড়লাম।

এখানে বক্তব্য, পরাধীনতার দরুন উনবিংশ শতাব্দীতে মনের দিক থেকে আমরা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছিলাম। জীবনের কেন্দ্রস্থ ভারতীয় ও মধ্যযুগার্জিত মুসলিম ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে নতুন ঐতিহ্য অর্জনে আমরা এমনই তৎপর হই যে, আমরা ভুলে গেলাম, কোন ঐতিহ্যের সঙ্গে নাড়ীর যোগ না থাকলে জাতির জীবনীশক্তি অবক্ষয়ের পথে যায়।

আমাদের ঐতিহ্যগত চরিত্রে কেন্দ্রস্থ ভার না থাকায় আমরা বিদেশী ধাক্কা সামলাতে পারি নি। বস্তুসম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় আমাদের অবচেতন মনে একটা সংস্কৃতির ভাব এসেছিল ঠিক, কিন্তু তা যে কত শূন্যগর্ভ আমাদের পরবর্তী কালের কার্যাবলীই তার সাক্ষ্য দেয়।

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ধর্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকরা প্রচলিত সমাজ ও ধর্মকে এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন যাতে ইংরেজ জীবনের যুক্তিবাদ, তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তাদের বস্তু-সমৃদ্ধ জীবন-মান আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারি। এই গ্রহণ-বর্জনের ফলে জীবনে প্রথম যে অরাজকতা দেখা দেয় তাকেই সীমিত করবার জন্য দেশজ ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও মঠের আধিক্য দেখা দেয়। কিন্তু কোন ধর্মপ্রচারকই এই বস্তু-সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করে ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল কথা 'সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তা' প্রচার করলেন না। আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বস্তু-সমৃদ্ধিকে শ্রেয় ও প্রেয় বলে মেনে নিয়েছি।

ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে আজ যে-পরিবর্তন এসেছে তা-ও দেশজ বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের রাজনৈতিক চৈতন্যের মূলে যে স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষা ছিল (১৮৮৫, হিউম সাহেবের প্রচেষ্টায়) তা ষোল আনা বিদেশী চিন্তাজাত। 'বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে যে-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় তার পরিকল্পনা বিদেশী হলেও তাকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন বলা যায়; কিন্তু ঐ আন্দোলন যখন গণ-আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা হল তখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বিশ্বাসী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা সে-আন্দোলনের সামিল হল না'। আন্দোলন হল, কিছুটা গণসংযোগ হল, অন্ত্যফল হিসাবে গণ-আন্দোলন দেখা দিল না। পরে গণবিপ্লবের নামে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি ডায়ালেক্‌টিক্‌স-র ধারায় নতুন দৃষ্টিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে জন-গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে বস্তুকেন্দ্রিক এক নতুন জীবনবেদ ও

সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেলেন, বিদেশ থেকে আমদানি করা কোন নীতি ধর্মপ্রাণ ভারতের মাটিতে দানা বাঁধতে পারে না। ভারতের একটা নিজস্ব ধারা আছে, যে-ধারার ইতিহাস কম হলেও পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতির ফল। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না। অথচ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাকা হয় সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে। 'ফলে, এখানে যে রাজনৈতিক ধারা চালু হল তা বুদ্ধিগত, লিখিত সংবিধান বিদেশী চিন্তা-প্রসূত বিশেষ একটা পছন্দ মাত্র। এই ধারাকে নিজস্ব করবার চেষ্টার জন্য আমরা ক্রমাগত অসুবিধায় পড়ছি'।

এ-থেকে বোঝা যায়, বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ইংরেজ ও তাদের অনুকরণের কথা। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজ ও বিদেশীদের অনুগামী হয়েছি। অনুকরণ আরও অনুকরণের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে। মনের কাছে এমন কোন ঐতিহ্যগত আদর্শ থাকে না যার উপর নির্ভর করে মন যে-কোন আগন্তুক মতবাদকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। 'আজ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে যে ধার করা বা অনুকরণ করা ঐতিহ্য নিঃসম্বল। তার ব্যবহারে এমন কিছু সৃষ্টি করা যায় না যার উপসত্ব উত্তরকালে দেশবাসী ভোগ করতে পারে।'

পুর্বোক্ত রেনেসাঁর আর একটা বড দিক হল উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-চেতনা ও তার সংস্কার।[২৭] সে-সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হবে। লক্ষ্য, ঐ সংস্কারে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অবদান ও প্রকৃত পথ-প্রদর্শক রূপে বিভ্রান্ত অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসীকে স্বগৃহে ও স্ব-ভাবে ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস।

ধর্ম-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রথম দেখা দিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তাঁর পাণ্ডিত্য নানা দিকে প্রসারিত ছিল। শোনা যায় তিনি হিন্দু, খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সকলের মূল গ্রন্থাদিও পডেছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের চর্চার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কিংবদন্তী আছে, তিনি তন্ত্রসাধনা করেন এবং মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে তার প্রতিষ্ঠিত সমাজের মূল সূত্র সকল সংগ্রহ করেন। ইসলামের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রামমোহনের এই প্রয়াসকে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে রেখেছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়। তিনি ঐ চেতনাকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) হাতে তুলে দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ধারায় ব্রাহ্মধর্মের মূল সূত্র সকল রচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রামমোহন-প্রদর্শিত পথের ভুল-ক্রটি তিনি সংশোধন

করেন। ব্রাহ্মধর্মের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। দেবেন্দ্রনাথের মতে হিন্দুধর্মের সংস্কারই ছিল রামমোহনের উদ্দেশ্য। পরবর্তী ধাপে খ্রীষ্টান ধর্মে সুপণ্ডিত বিখ্যাত বাগ্মী পূর্বোক্ত কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মসমাজে প্রাণ সঞ্চার করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকেই প্রথম ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত করেন এবং 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আদর্শগত বিরোধ হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কেশবসেন-চালিত প্রগতিশীল গোষ্ঠী 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৬ সালে। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথমে কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শে প্রভাবিত হন এবং তাঁর 'আশার দলে' (Band of Hope) যোগ দেন। সে-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু কেশব সেনের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি সংহতি রাখতে পারেন নি। ফলে, কেশব সেনের অনুগামীদের মধ্যে অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন ১৮৭৮ সালে। কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগামীরা কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'নববিধান সঙ্ঘে' যোগ দেন। ত্রিধা-বিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে মনীষী ম্যাক্সমুলার মনে করেন, রামমোহন-রোপিত বীজ কালে বৃক্ষে পরিণত হল। তারই তিনটি শাখা পূর্বোক্ত ব্রাহ্মসমাজের তিনটি সম্প্রদায়। ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে রামমোহন হিন্দুধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের মিশ্রণ করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ সময় কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় মাদ্রাজে 'প্রার্থনাসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬৭)। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে ঐ সব আন্দোলন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা-সঞ্জাত।[২৮]

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩), ১০ই এপ্রিল, 'আযসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৫)। বেদের বিশুদ্ধ অংশের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে অধিকতর সংস্কৃত ও সুসংবদ্ধ করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন তিনি শুরু করেন, এবং হিন্দুধর্ম থেকে যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাঁদের হিন্দু-সমাজে ফিরিয়ে আনবার জন্য শুদ্ধি-আন্দোলনও প্রবর্তন করেন। আযসমাজে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত নয়। একেশ্বরবাদও তাঁরা মানেন না। বেদের সংহিতা-ভাগ, বিশেষভাবে ঋগ্বেদ সংহিতা ভাগের, মতই গ্রাহ্য। সায়নাচার্য ও মহীধরের ভাষ্য-টীকাদি আর্যসমাজের অনুগামীরা মানেন না। ১৮৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে দয়ানন্দ সরস্বতী কলকাতায় আসেন এবং উত্তর কলকাতায় সিঁথিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখে দয়ানন্দজী বলেছিলেন,—"আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল পড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষের মধ্যে তার ফল দেখছি। এঁকে দেখে প্রমাণ হল যে পণ্ডিতেরা

কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষরা মাখন বা সমস্তটা খান"।

১৮৭৫-সালে নিউইয়র্কে মাদাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট 'থিওসফিকাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে থিওসফির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অ্যানি বেসান্ত। তিনি বলেছিলেন, থিওসফিকাল আন্দোলন হিন্দু সমাজের ধর্ম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল, প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, মহাত্মা, এই সব নিয়ে থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না ......নানা জিনিস থেকে মনকে সরিয়ে এনে তাতে লাগাতে হয়"।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন, প্রার্থনা-সমাজ, থিওসফিকাল আন্দোলন, আর্যসমাজ প্রভৃতির কোনটিই পাশ্চাত্য-প্রভাব-মুক্ত নয়। অপর দিকে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার, ইসলামের প্রসার, নব্য-শিক্ষিতদের (ইয়ং বেঙ্গল) বিকৃত আচার-আচরণ, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মদের উন্নাসিকতা প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৎকালের রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল হিন্দুদের মধ্যে এক নতুন চেতনা দেখা দেয়। 'ধর্ম-সভা', 'গৌড়ীয় সমাজ', 'হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'......প্রভৃতি হিন্দু প্রতিষ্ঠান সকল নানা আক্রমণ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অপর দিকে, একদল চিন্তাশীল বিদগ্ধ ব্যক্তি তাৎকালিক হিন্দুর আচার, ব্যবহার, ধর্মাচরণ প্রভৃতি সংস্কারের জন্য মন দেন। কিছু পত্র-পত্রিকাও এ-কাজে এগিয়ে আসে। 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' যুক্তিসহকারে প্রমাণ করে দেখাল—'হিন্দুধর্মের তুল্য কোন জাতীয় ধর্ম নাই'। এখানে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল তথাকথিত হিন্দুসমাজপতিগণের বিলাস-ব্যসন। তখনকার সমাজচিত্র স্বামী বিবেকানন্দর ভাষায় বলা যায়,—'সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে পিষ্ট হইবার জন্য তাহাদের জন্ম।"[২৯]

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উনিশ শতকের ৭/৮ দশককে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান-কাল বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—"চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি, এ সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপর ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল।"[৩০] আবার কেউ কেউ বলেছেন এটি হচ্ছে ভারত-সংস্কৃতি তথা

ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান। ১৮৬৫-৮৫—এই কুড়ি বছরের ভারতীয় জীবন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় থেকেই বিস্মৃতপ্রায় হিন্দু ঐতিহ্য ও মূল্য-বোধের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। ১৮৭২-সালে কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ উদ্যোগে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রবর্তিত হয়। চারদিকে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন, "আমার এইরূপ আশা হইতেছে পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছে, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও ধর্মের জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।" মনোমোহন বসু, বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ তখন থেকেই হিন্দুর আচার, ব্যবহার, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সজাগ হলেন। নবীনচন্দ্র সেন হিন্দুর পুরাণ সকলকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক ধর্মের সমর্থনে যুক্তিবাদের আশ্রয় নেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। এ-সকল উদ্যোগের ফলে হিন্দুধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'স্বদেশ অনুরাগ' প্রবন্ধে লেখা হয়, "প্রথমে যখন ইংরেজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্তিত হয় তখন ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা হিন্দুর ধর্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচার-ব্যাবহার অপকৃষ্ট নহে ইহা এখনকার ইংরেজীতে কৃতবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহিমা এবং হিন্দুধর্মের ও হিন্দুর আচার-ব্যবহারের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে তাঁহারা উৎসাহে উন্নত হইয়া উঠেন। এক্ষণকার লোকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর বিষয়ে এমন সব ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা অন্য কোন জাতির ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায় না। এবং এমন সকল সুরীতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহা অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই"।[৩১]

প্রশ্ন—রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমার আলোচনায় তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এত কথা এল কেন?

কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ মূলতঃ একজন অধ্যাত্ম-সাধক হলেও তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। ভারতে আধ্যাত্মিকতা ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। অতএব, রামকৃষ্ণের কাছে ভারতের অধ্যাত্ম-বাণী একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-মুক্তির নির্দেশক, অন্যদিকে তেমনি মানবতার বাণী, সমাজ-কল্যাণের কথা। তাই তিনি ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মনুষ্যত্বকে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার

জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সংস্কার ও প্রগতি দেশের জাতীয় জীবনে তখনই সুফল আনতে পারে যখন জাতির প্রাণের গভীর হতে জাগৃতির আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয়, জাতির আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন ঘটে। উনিশ শতকের আহ্বানে ও পরবর্তী কালে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে ভারতীয় নবচেতনা রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুটা জেগেছিল সেটা প্রকৃত ভারতীয় না হলেও ইংরেজী-জানা কিছু লোকের চিত্তে যে একটা দোলা দিয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐ চেতনাই প্রকৃত ভারতীয়তার রূপ নিয়ে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করল রামকৃষ্ণ 'ফেনোমেননের' মধ্য দিয়ে, আত্মবিস্মৃত জাতি স্ব-ভাবের সন্ধান পেল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ভক্তদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ঐ বাণী বাস্তব রূপ পেল ভারতের চিত্তভূমিতে। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণের কথা ছড়িয়ে পড়ল।

পুরাণমতে, বেদমতে, তন্ত্রমতে, অদ্বৈতভাবে, এবং হিন্দুশাস্ত্র-বহির্ভূত মতাদিতে অশ্রুতপূর্ব কঠোর সাধনার পর রামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্ম-সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য লাভ করেন। (সাম্রাজ্য—সৃজনী-শক্তির মূল কেন্দ্রকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ; স্বারাজ্য—আত্মস্বরূপ মহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।) প্রচলিত বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে যাওয়া সাধনরাজ্য পেরিয়ে ভারত-আত্মার নবীনতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পরিপূর্ণ মানব রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এ-সব কথা আমরা পূর্বে বলেছি (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ)। তাঁর পরম দুর্লভ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলা যায় "রামকৃষ্ণের ধর্মীয় চেতনা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এমন এক স্তরে উঠেছিল, সম্ভবতঃ অন্য কোন মহাপুরুষ তাঁর পূর্বে ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে ঐ স্তরে উঠেন নি।[৩২]

রমা রঁলার মতে ১৮৭৪ সালের কাছাকাছি সময়ে রামকৃষ্ণ তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ধর্মীয় আন্তর মণ্ডলটি সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং—তাঁর নিজের কথায়—আহরণ করেছিলেন জ্ঞানবৃক্ষের তিনটি ফল—করুণা, ভক্তি ও ত্যাগ। পরে তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য 'বহুজনহিতায়', 'বহুজনসুখায়', নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

ইংরেজী ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ বেলঘরিয়ার তপোবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। ভারতবর্ষের তাৎকালিক ধর্মের ইতিহাসে, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের নব আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে, ঐ ঘটনাটি বিশেষ অর্থবহ। "পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসদেবও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া

পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়” (‘ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা’)। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। “…কেশবচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে ভগবান পরিস্ফুট হইতেন।”

ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাধকদের শ্রীরামকৃষ্ণ এগার বৎসর প্রায় নিজের কাছে টেনে রেখেছিলেন। প্রত্যেককেই নিজের অংশীদার করেছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল সে-সম্বন্ধে রমা রঁলার ভঙ্গীতে বলা যায়,—‘রামকৃষ্ণের আনন্দময় প্রবাহধারা আপনাকে সকল আত্মার গোচরীভূত করেছিল। তিনি ছিলেন এক অমোঘ গতি-শক্তি, তিনি ছিলেন ভিত্তিভূমি, তিনি ছিলেন শক্তিপ্রবাহ, অন্য সকল ছোট নদী, উপনদী রামকৃষ্ণ-মহানদীর দিকে ধাবিত হইত। রামকৃষ্ণ ছিলেন জাহ্নবী’।

রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি। সেই অন্তর্নিহিত শক্তিবীজ রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম স্পর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল। অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের শক্তিকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন এবং সক্রিয় করে তুলেছিলেন। এখানে স্মর্তব্য, আম গাছে যেমন কাঁঠাল ফলে না তেমনি সবাই সব হতে পারে না। অধ্যাত্ম গুরুর কাজ হল শিষ্যের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তাকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, তার পূর্ণ প্রকাশের যে সকল বাধা আছে তা দূর করা। উল্লেখ্য, জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানুষের জীবনে বংশপরম্পরা, পরিবেশ, প্রতিবেশ প্রভৃতির একটা বড় প্রভাব আছে; কিন্তু মানুষের প্রকৃত নির্মায়ক উপাদান ও সৃজনী-শক্তি ও তার প্রাক্তন-জন্ম সংস্কার নিয়ে মানুষ এই জগতে আসে। তা না হলে একই পিতা-মাতার সন্তান, একই পরিবেশ ও শিক্ষায় পুষ্ট মানুষ একজন অপর থেকে পৃথক হয় কী করে? আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একটু নজর দিলেই আমরা তার প্রমাণ পাই। এই পার্থক্যকে যদি আমরা ব্যতিক্রম আখ্যা দিই, তাহলে সে-ব্যতিক্রমেরই বা ব্যাখ্যা কী? ফলে, আমাদের ব্যক্তিজীবনে একটা কিছু মানতে হয় যা অবশ্য ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অদৃষ্ট। এই অ-দৃষ্ট বা প্রাক্তন জীবের জন্ম-জন্মার্জিত কর্মের ফল। অতএব, অধ্যাত্ম দৃষ্টি ছাড়া জীবের পুরো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণের সে-দৃষ্টি ছিল, তাই তিনি মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর মূলে প্রবেশ করতে পারতেন। মুহূর্তের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মূল শক্তিকে তিনি বুঝে ফেলেছিলেন। তাই বিবেকানন্দর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অতটা

বিশ্বাস ছিল। অতএব, বিবেকানন্দ যা কিছু ভেবেছেন বা করেছেন সবই ঠাকুরের ভাবনা, ঠাকুরের নির্দেশ। তা-ছাড়াও, ১৮৮৬ খ্রীঃ কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে সব শক্তি দিয়ে যান।

স্বামীজী বুঝেছিলেন অধ্যাত্ম-শক্তি ভারতের মূল শক্তি। সে-শক্তি ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ছড়ান রয়েছে। তাই বিবেকানন্দর জীবন-ভাবনা ছিল অধ্যাত্ম সুরে বাঁধা এবং ব্যবহার-ভূমিতে ঐ ভাবনা ছিল সামাজিক কল্যাণভিত্তিক; ছড়ান অধ্যাত্ম শক্তির ঐক্যের মধ্যে ভারতের ঐক্য নিহিত। ভারতীয় জীবনের মূল অধ্যাত্ম সুরে বাঁধা।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন খোলা মনের মানুষ। কোন প্রকার তুচ্ছতা বা নীচতা তাঁর মনে স্থান পেত না। অধ্যাত্ম-শক্তিতে উজ্জীবিত মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যেখানে যা ভাল জিনিস দেখতেন তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই ভারতীয় নীতি-বোধ ও আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়ে তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করতে বলেন নি। গ্রীসের সৌন্দযবোধ ও মানবিক উৎকর্ষ, রোমের যাথার্থ্য-প্রীতি, ইংরেজের অধ্যবসায় বা লেগে থাকা, জার্মানীর সামগ্রিক দৃষ্টি, সবই স্বামীজীর মতে গ্রহণযোগ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের ফল তিনি গ্রহণ করতে বলেছেন জনগণের কর্মকুশলতার উৎকর্ষ ও বৈষয়িক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে। স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সামাজিক বৈষম্য, সব বিষয়ের তিনি আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারত ও নব্য ভারতের যোগসূত্রকার হিসাবে তিনি সব সময় ভারতবাসীকে সতর্ক করেছেন, পার্থিব সম্পদের জন্য কোন প্রকার কপটতা আমাদের মনে যেন স্থান না পায়।

পূর্বোক্ত 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'—ঠাকুরের এই উক্তিটিকে মূল মন্ত্র করে স্বভাবে স্থিত, শিবচেতনায় উদ্বুদ্ধ, বিবেকানন্দ আজীবন দীন-দুঃখীর নিঃস্বার্থ সেবা করে গেছেন। অধ্যাত্মভূমিতে বনের বেদান্তকে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন; বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ ঈশ্বর-অনুধ্যানের জন্য গুহায় আশ্রয় নিলেন না, আশ্রয় নিলেন সর্বহারাদের মাঝে।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'; ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হল, ভারতবাসী নিজের দিকে ফিরে তাকাল। বিবেকানন্দ বললেন, যে-দেশের এত প্রাকৃতিক সম্পদ, সে-দেশ বৈষয়িক দিক থেকে এত দরিদ্র হবে কেন? যে-দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ সব চেয়ে প্রাচীন সেই দেশ পরধর্মের মোহে বিভ্রান্ত হবে কেন?



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার ফল বিবেকানন্দর জীবনদর্শনে রূপ নিল 'সোঽহং'-বাদে। শিক্ষিত সমাজকে স্বামীজী শোনালেন বেদান্তর কথা, নির্যাতিত অবহেলিত মনুষ্যত্বকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তোমরা প্রত্যেকে নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছে, তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে"। সমাজের ধনী ও উচ্চবর্ণের লোকদের তিনি ধিক্কার দিলেন,—"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে .... মেথরের ঝুপরির মধ্য হতে"। নির্ভীক কণ্ঠে সন্ন্যাসী বললেন, "'এরাই আমার নারায়ণ"।

দেশের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার। স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশে সেই শিক্ষার প্রচলন যে-শিক্ষা মানুষকে অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, নৈতিক বলে বলীয়ান করে। যে-শিক্ষা ভারতের প্রাচীন লুপ্ত ঐতিহ্যকে উদ্ধার করতে সক্ষম স্বামীজীর মতে সেই শিক্ষাই হবে আসল শিক্ষা। বিজাতীয় সভ্যতার চাকচিক্যে মোহগ্রস্থ হওয়া শিক্ষা নয়, তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষের উন্নতি সে-পথে আসতে পারে না। ভারতের উন্নতির নিজস্ব একটা পথ আছে; অতি সুপ্রাচীন একটা নীতি—**সে নীতি ভারতের ধর্মনীতি**। 'ধর্ম' বলতে এখানে ক্রিয়াবহুল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, দেব-দেবীর পুজা-অর্চনা নয়—অর্থাৎ পুরোহিততন্ত্র নয়। ধর্ম হল এখানে ধারণ করবার শক্তি, নৈতিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শক্তি, ধর্মই হল সমাজের মূল তন্ত্র, সমাজ-সংহতির মূল মন্ত্র। এই ধর্মনীতি মানুষকে শেখাতে পারে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি বলতে কী বোঝায়। সমাজতান্ত্রিক দেশ এই ভারতবর্ষ, গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ধর্মনীতির মূল লক্ষ্য। ভারতবর্ষে কোন কাজই বড় নয়, কোন কাজই ছোট নয়; সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেবাই ভারতের মূল কথা। স্বধর্ম পালনই ভারতীয়তার বৈশিষ্ট্য। এই ধর্মনীতির ঔদার্যগুণেই ভারত এতদিন বিশ্বের দরবারে আদৃত হয়ে এসেছে।

স্বামীজী ছিলেন এক দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য গতিশক্তি, তাই তাঁর চিন্তার কোন ক্ষেত্রেই প্রগতির পথ রুদ্ধ হয় নি। উনিশ শতকে স্বামীজী ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আধুনিক ভারতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের চিন্তার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। দেশের নানা জায়গায় জনকল্যাণের জন্য যে-সকল কর্মী তিনি নিয়োগ করেছিলেন তাদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে বলেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতের মূলমন্ত্রে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বামীজী বর্তমান ভারতের সমস্যাকে আধুনিক ধারায় সমাধান করবার কথা বলে গেছেন। আমরা উনিশ শতকের রেনেসাঁর আলোচনায় বর্জনের কথা বলেছি, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 'বর্জন' মানে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ গ্রহণ নয়; কারণ, তা কখনও সম্ভব নয়। সেদিন ইংরেজ-সংস্পর্শে এসে যুক্তির দোহাই দিয়ে যে যুক্তিহীন প্রভাব আমাদের জীবনে এসেছিল, তারই বর্জন। অতএব, রামকৃষ্ণ-মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালে সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাস্তব দিক থেকে ভারতবর্ষের মূল সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে গেছেন।

দেশ-গঠনের কাজে স্বামীজীর আশা ও ভরসার স্থল ছিল ভারতের যুবশক্তি। স্বামীজী চেয়েছিলেন যুবকগণ হবে আত্মবিশ্বাসী ও সংযমী। তাদের পেশী হবে লোহার মত, আর স্নায়ুমণ্ডলী হবে ইস্পাত-সদৃশ, আর তারই বলে তারা হবে প্রবল ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন। যুবসমাজকে ডাক দিয়ে স্বামীজী বললেন, "আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দেবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথা বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়"।

বিবেকানন্দর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি ছিলেন নির্ভীক, ভয়ের কোন সংস্কার তাঁর মধ্যে ছিল না। তা ছাড়াও, তাঁর চিন্তার মূলে ছিল এক অখণ্ড মানবতা-বোধ। কোন প্রকার তুচ্ছতা, নীচতা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারত না। যা-কিছু তিনি ভাবতেন বা বলতেন সবই তাঁর হৃদয়ের অনাহত চক্র থেকে ধ্বনিত হত। তাই বিবেকানন্দর কথা কেবল মাত্র শব্দ-যোজনা নয়, মন্ত্র। মন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ বৈখরী শব্দের পার্থক্য হল—মন্ত্র চৈতন্যময়ী, তা হৃদয়কে স্পর্শ করে, আর বৈখরী শব্দের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয়।

বিবেকানন্দর উপাস্য ছিলেন সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর, মন্ত্র ছিল 'শিবোঽহং', আর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্ব। তাই তিনি বলেছেন, 'হে জগদম্বে, তুমি আমার মনের দুর্বলতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।

উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁর অন্ত্যফল হিসাবে ইংরেজ-অনুকরণ ও ভিক্টোরিয়ান ধারার কতকগুলি তথাকথিত সদাচার ও সংস্কৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে ভারতীয় সমাজের বাইরের কাঠামোয় মুষ্টিমেয় লোকের আচরণে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব দেখা দিয়েছিল; কিন্তু তার ভিত্তিমূল বিদেশী সংস্কারজাত হওয়ায় সে-কাঠামোয় ভারতীয়তা বসে নি, এবং ধর্মক্ষেত্রেও যে-সংস্কারের ভাবনা এসেছিল তাও পুরোপুরি দেশজ না হওয়ায় ভারতীয়' জীবনে সার্থক ফলপ্রসূ হয় নি। ঐ সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি ছিল বহু উর্ধ্বে। তাই ঐ সময় রামকৃষ্ণই প্রথম ব্যক্তি যিনি অনন্থকরণীয় ভঙ্গিতে ভারতবর্ষের মূল সমস্যার কথা বললেন। স্বামীজীর পক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরে প্রবেশ করা শক্ত হয় নি ; কারণ, তাঁর দীক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বিবেকানন্দ সেদিন জাতির জীবনে যে-আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন তার ধারা আজও নিরবচ্ছিন্ন চলেছে ; সেদিন যা ছিল সুপ্ত, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে তা আজ বিংশ শতাব্দীর ৭/৮ দশকে প্রচণ্ড শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবন্ত। ভারতমাতার সন্তানকুলের হৃদয়ে বিবেকানন্দ আজও অধিষ্ঠিত।

প্রশ্ন—বিবেকানন্দ দেহ রেখেছেন ১৯০২ সালে ; মধ্যে ছিয়াত্তর বছর সময় পেরিয়ে গেছে, তবুও বাইরের দিক থেকে আমাদের ভারতীয়দের চরিত্র এতটুকু পালটায় নি কেন? আমরা এখনও ত সেই পরমুখাপেক্ষী, পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে দাসত্ব করছি। এখনও ত আমরা ইংরেজী শিক্ষার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারি নি। এখনও ত আমরা সাহেব না বললে কোন কিছুর মূল্য দিই না। আমাদের আচার, ব্যবহার, চিন্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ কোথায়ও ত ভারতীয়তার ছাপ পড়ে নি।

উত্তর—একটা জাতির ইতিহাসে ছিয়াত্তর বছর সময় খুব বেশী নয়। তা ছাড়াও, রাজনৈতিক দিক থেকে দীর্ঘ দিন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল—শক, হুণ, পাঠান, মোগল এবং অবশেষে ইংরেজের অধীন। তাই আমাদের দাসসুলভ মানসিকতা বাইরের দিক থেকে এখনও চলেছে। একটু সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে দেখা যাবে ঐ মানসিকতার বিরুদ্ধে একটা 'প্রটেষ্ট' (প্রতিবাদ) এখনই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। ইতিহাসের যেমন একটা লিখিত দিক আছে তেমনি তার একটা অলিখিত ইঙ্গিত-ও আছে। সেই অলিখিত ইঙ্গিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একদিকে আজ মানুষের মনে যেমন হতাশা আছে তেমনি আছে চেতনার আলোকবিচ্ছুরণ। অতএব, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর সমাজ-চেতনার কথা, অর্থাৎ প্রকৃত ভারতীয়তার কথা, অজ্ঞাতসারে আমাদের চেতনায় অনুপ্রবেশ করেছে। পাশ্চাত্ত্যও আজ সে-কথা শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহী, কারণ তারাও আজ অবসাদক্লিষ্ট—তারা আজ বুঝেছে, অধ্যাত্ম-'কনটেণ্ট' ছাড়া সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। অতএব, আগামী দিনের ভারতবর্ষ শিব-চেতনার ভারতবর্ষ, শক্তি-মহিমার ভারতবর্ষ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভারতবর্ষ, যেখানে প্রাচীন ভারতের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আধুনিক ভারতে সমস্যা ও সমাধানের এক অপূর্ব মিলনের পথ তৈরী হতে চলেছে।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য ও গৃহী ভক্তদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে।

নরেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-১৯০২):—শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে পরবর্তী কালে ইনি স্বামী বিবেকানন্দ রূপে সুপ্ত দেশবাসীকে প্রকৃত ভারতীয় চেতনায় জাগ্রত করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। নিঃস্বার্থ কর্মের আদর্শ তিনি নিজ আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীকে তিনি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেন।

রাখাল (১৮৬৩-১৯২২):—শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দরূপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংগঠন করেন।

তারক (১৮৫৪-১৯৩৪):—পরবর্তী কালে তিনি স্বামী শিবানন্দ নামে পরিচিত হন। ঠাকুরকে প্রথম দর্শনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর সাধনার সিদ্ধি ঠাকুরের মধ্যে অপেক্ষিত। জীবনের প্রান্তদেশে এসে তিনি বলেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মানুষ না দেবতা সে-সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত তখনও স্থির হয় নি। তবে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য, সর্বোচ্চ ত্যাগ ও জ্ঞানের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন প্রেমের অবতার।

বাবুরাম (১৮৬১-১৯১৮):—ঠিক বিশ বছর বয়সে বাবুরাম ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত হন। শিশুর মত সরল এই ভক্তটি সংসারের সব কিছুর উর্ধ্বে ছিলেন। ঠাকুর বলতেন, বাবুরামের অস্থি, মাংস, মজ্জা সব শুদ্ধ, কোন অশুদ্ধ চিন্তা তাঁর মনকে স্পর্শ করে না।

যোগীন(১৮৬১-১৮৯৯):—ষোল-সতের বছর বয়সে যোগীন রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর যোগীনের সুপ্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা ধরে ফেলেন। পরবর্তী কালে তিনি স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হন। যোগীনকে লক্ষ্য করেই ঠাকুর বলেছিলেন, সাধু হতে হবে বলে যে ঠকতে হবে তার কোন মানে নেই।

নিরঞ্জন (১৮৬২-১৯০৪):—তরুণ নিরঞ্জনকে ঠাকুর একদিন বললেন, ভূতের চিন্তা করলে মানুষ ভূত হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে মানুষের জীবন দিব্যভাব লাভ করে। তুমি যদি ঈশ্বরচিন্তা না কর তবে তোমার জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে। তিনিই পরবর্তী কালে নিরঞ্জনানন্দ হন।

শরৎ (১৮৬৫-১৯২৭):—দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক যুবকের কোলের উপর বসে পড়লেন, পরে ব্যবহারিক জ্ঞান ফিরে এলে ঠাকুর বললেন, আমি পরীক্ষা করছিলাম কতখানি ভার তুই সহ্য করতে পারিস। তিনিই পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ হয়ে দীর্ঘদিন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গুরুতর দায়িত্বভার বহন করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'কার হিসাবে তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

শশী (১৮৬৩-১৯১১) :—ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক, নিঃস্বার্থ কর্মী শশী-মহারাজ পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণানন্দ হন।

গোপাল (বড়) (—১৯০৯) :—শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন গোপাল বললেন, তিনি কয়েকখানা গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা সন্ন্যাসীদের দিতে চান। উত্তরে ঠাকুর বললেন, এই সব যুবকদের (নরেন্দ্র, রাখাল ইত্যাদি) চেয়ে যোগ্যতর সন্ন্যাসী তুমি আর পাবে না। গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা তুমি ওদের দিতে পার। গোপাল তখন কয়েকখানা গেরুয়া বস্ত্র ঠাকুরের কাছে এনে দিলেন। ঠাকুর সেগুলি তাঁর শিষ্যদের দিলেন। এই ভাবেই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের বীজ রোপিত হল।

লাটু (—১৯২০) :—প্রকৃত গুরুসেবা কী-ভাবে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে লাটু মহারাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামচন্দ্রের জীবনে হনুমান যেমন ছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে লাটু মহারাজ ছিলেন সেইরূপ। স্বামী বিবেকান্দর মতে ঠাকুরের জীবনের সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা হল লাটু। স্বামী লাটুই অদ্ভুতানন্দ নামে পরিচিত।

হরিনাথ (১৮৬৩-১৯২১) :—কৃচ্ছ্রতার প্রতিমূর্তি বৈদান্তিক হরিনাথ আপন শুচিতা রক্ষার জন্য এমন কি ছোট ছোট মেয়েদেরও এড়িয়ে চলতেন। ঠাকুর একদিন তাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে বললেন, তুমি যত মেয়েদের এড়িয়ে চলবে ততই জালে জড়িয়ে পড়বে। মাতৃশক্তির প্রকাশ হিসাবে তিনি মেয়েদের দেখতে বললেন।

সারদা (১৮৬৫-১৯১৫):—ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে মনের আমূল পরিবর্তন হয় এবং ত্রিগুণাতীতানন্দ নামে প্রতিষ্ঠিত হন।

কালী (১৮৬৩-১৯২১) :—শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তদের আন্তর মণ্ডলের প্রধানদের মধ্যে কালী ছিলেন একজন। কাশীপুর উদ্যানবাটীর কোন একটি পুকুরে কালী একদিন কয়েকটি মাছ ধরেন। ঠাকুর সে কথা জানতে পেরে কালীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি অত নির্মম কেন?' সহজভাবে কালী জবাব দিল, 'মাছ ধরে আমি কোন অন্যায় করি নি। আত্মা ত অবিনশ্বর'। ঠাকুর বললেন, 'তুমি ভুল বুঝেছ, যার আত্মোপলব্ধি হয়েছে সে কখনও নির্মম হতে পারে না। সে কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না। এই কথাটা ভেবো'। ঠাকুরের ঐ কথা কালীকে ভাবাল ও তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটল। বিশ্বের কাছে তিনি স্বামী অভেদানন্দ নামে পরিচিত হলেন।

সুবোধ (১৮৬৭-১৯৩২) :—খোলা মনের মানুষ সুবোধ যা বুঝতেন বিনা

দ্বিধায় তাই বলে ফেলতেন। একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর নিজের সম্পর্কে সুবোধের মনোভাব জিজ্ঞাসা করলেন। সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, অনেকে আপনাকে অনেক কথা বলে, নিজে প্রমাণ না পেলে আমি কারও কোন মন্তব্য বিশ্বাস করি না। ক্রমে সুবোধ ঠাকুরের নিকট সান্নিধ্যে এসে উপলব্ধি করলেন-ঠাকুর হলেন জীবের মুক্তিদাতা।

গঙ্গাধর (১৮৬৪-১৯৩৭):—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে পরবর্তী কালে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে পরিচিত হন, এবং নিঃস্বার্থভাবে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজ করেন।

হরিপ্রসন্ন (১৮৬৮-১৯৩৮):—পরবর্তী কালে তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। হরিপ্রসন্ন একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মশাই, আপনার কাছে যে সকল যুবকরা আসে আপনি তাদের বৈরাগ্যের কথা, সন্ন্যাসের কথা বলেন কেন? উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আগের জন্মে ওরা সব কত অধ্যাত্ম সাধন করেছে, কৃচ্ছ্রতা বরণ করেছে, ঐ সব শুদ্ধ ছেলেদের সঙ্গে আমি যদি ধর্মের কথা না বলি, তবে কাদের বলব?'

পুর্ণচন্দ্র ঘোষ (১৮৭১-১৯১৩):—ঠাকুর একে বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত (ঈশ্বরকোটি) আখ্যা দেন।

হীরানন্দ সখীরাম আদবনি (১৮৬৩-১৮৯৩):—সিন্ধু প্রদেশের লোক, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি সিন্ধু থেকে (কলিকাতা—সিন্ধু ২২০০ মাইল) কাশীপুরে ঠাকুরকে দেখতে আসেন।

গৃহী পুরুষ ভক্তদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-১৮৯৯), বলরাম বসু (১৮৪২-১৮৯০), মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২), সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৫০-১৮৯০), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), দুর্গাচরণ নাগ (১৮৪৬-১৮৯৯) প্রভৃতি।

গৃহী স্ত্রীভক্তদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—অঘোরমণি দেবী (১৮২২-১৯০৬), গোলাপ মা (—১৯২৪), গৌরী মা (—১৯৩৮), যোগীন মা (১৮৫১-১৯২৪), লক্ষ্মী দেবী (১৮৬৪-১৯২৪) এবং আরও অনেকে।

তা-ছাড়াও, মথুরমোহন বিশ্বাস, শম্ভুচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিগণ ভক্ত হিসাবে ঠাকুরকে দেখাশোনা করতেন। ঠাকুর তাদের রসদদার আখ্যা দেন।

সন্ন্যাসী শিষ্য, পুরুষ ও স্ত্রী গৃহী ভক্তগণ হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার সাক্ষাৎ ফল। ঠাকুরের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি যাকেই দেখতেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অন্তরে প্রবেশ করতে

পারতেন এবং তার প্রকৃত উন্মেষের পক্ষে যে-সকল বাধা থাকত—বিশেষভাবে অহংকার—তিনি তা দূর করতেন কখনও উপদেশ দিয়ে, কখনও তাদের স্পর্শ করে, কখনও বা নিজে আচরণ করে। স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ঈশ্বরমুখীন করা এবং স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী তাদের ঈশ্বর উপলব্ধি করান ছিল ঠাকুরের সাধনার মূল লক্ষ্য। হরিপ্রসন্নর সঙ্গে কুস্তী করে, সারদাকে দিয়ে পা ধোয়ার জল আনিয়ে, শরৎ মহারাজের কোলে বসে তাঁর দায়-দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা যাচাই করা প্রভৃতি ঘটনা সত্যাই বিস্ময়কর। ঠাকুরের লক্ষ্য ছিল, যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী তৎ তৎ ভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। ঠাকুর প্রকৃত অন্তর্যামী ছিলেন, তাই যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসত তাদের মনের খবর পেতে ঠাকুরের কালবিলম্ব হত না।

আর একটা বিষয়, ঠাকুরের সমকালীন বহু ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংলা তথা ভারতে জন্মেছিলেন এবং অনেকে তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী নতুন সংস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা করে গেছেন। এখানে প্রশ্ন, প্রতিষ্ঠাতাদের মৃত্যুর পর ঐ সকল সংস্থার অনেকগুলিই জনসমাজে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, এবং কতকগুলি একমাত্র নামে পর্যবসিত হয়েছে, কেন? আবার, রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে পরম্পরা গড়ে উঠল তার প্রভাব ক্রমেই ব্যাপ্ত হতে চলেছে অধ্যাত্ম-শক্তির উৎস হিসাবে—কেন? তার কারণ, সম্ভবত কোন একটা আদর্শকে জীবনে কার্যকর করবার জন্য প্রয়োজন যোগ্য উত্তর-সাধক এবং প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুগামীর দল, যারা ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আদর্শকে বড় করে দেখতে জানে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। উত্তরসাধক তৈরীর কাজ বড় দুরূহ ব্যাপার। নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করবার সাধনা না থাকলে যোগ্য প্রতিনিধি তৈরী করা যায় না। আধ্যাত্ম জগতের কুশলী কারিগর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিঃস্বার্থ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল ছিলেন। তা-ছাড়াও, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা কেবলমাত্র অধ্যাত্ম জগতেই বদ্ধ ছিল না। তিনি আদর্শ গৃহী তৈরী করে গেছেন, ভারতবর্ষে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। নাগ মহাশয় (যাঁর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সারা পৃথিবী ঘুরেও নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহৎ হৃদয়ের মানুষ একজনও তাঁর চোখে পড়ে নি), মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভাবান্তর ও ঠাকুরকে 'বকলমা'-দেওয়া বিংশ শতাব্দীতে রূপকথার কাহিনী বলে মনে হয়। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদের ভক্তি

ও আদর্শনিষ্ঠা প্রাচীন ভারতের নারী-ঐতিহ্যের কাহিনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখন প্রশ্ন, বণিক-বুদ্ধি চালিত, রাজনীতি-সর্বস্ব, তথাকথিত ব্যক্তি-স্বার্থে বিশ্বাসী বর্তমান স্বার্থান্ধ পরিবেশে, সাধারণ মানুষ কী করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দব কথার মূলে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে? অর্থাৎ, বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষের আচরণ হবে কী?

সামাজিক দায়-দায়িত্ব, কৃত্য ও অবশ্যকৃত্য এই তিনটি বিধি সম্পর্কে সচেতনতা মনুষ্যপদবাচ্য ব্যক্তির লক্ষণ।

প্রথমত, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের যেমন তার প্রতি একটা দায়িত্ব আছে ব্যক্তি হিসাবে প্রতিটি মানুষেরও সমাজের উপর তেমনই কর্তব্য আছে। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ব্যক্তি-মানুষ এমন কিছু অবশ্যই করবে না যাতে সমাজের সংহতি বা ঐক্য কোন ক্রমে ব্যাহত হতে পারে। অপরপক্ষে, সমাজও এমন কোন কঠোর বিধি আরোপ করবে না যাতে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হয়। ভারতের সমাজসেবীরা তাই সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনার পক্ষে কতকগুলি বিধি-নিষেধের কথা বলে গেছেন। সমাজই ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। সমাজ যত অবক্ষয়ের পথে যায়, জাতির প্রাণশক্তিও তত কমজোরী হয়ে যায়। বিবেকানন্দ তাই বলতেন, ভারতের সমাজ তার যৌবনের উপবন,...বার্ধক্যের বারাণসী; সমাজ-মহামায়ার ছায়া।

দ্বিতীয়ত,—প্রতিটি মানুষ যেমন বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের অঙ্গ, তেমনি সীমিত পরিধির মধ্যে পরিবারের একজন। মাতা, পিতা, ভাই বোন, স্বামী, স্ত্রী সব নিয়েই পরিবার। পরিবারই ব্যক্তি-মানুষের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র। সমাজের যেমন একটা ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি প্রতিটি পরিবারের একটা কৌল-পরম্পরা আছে—এই পরম্পরাই পরিবারের ঐক্য-সূত্র। এই ঐক্যসূত্র ছিন্ন হলে পরিবার ভেঙে যায়। পরিবার থেকেই মানুষ প্রথম স্নেহ, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা শেখে; এ-সকল মানুষের সহজাত বৃত্তি। পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য, পুত্রের প্রতি পিতার দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, সবই মানবিক গুণ। মানবিক গুণের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে মনুষ্যত্ব-বোধ। মনুষ্যত্ব-বোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 'অহং' বা 'ছোট-আমি'র সঙ্কীর্ণতা চলে যায়, মানুষ কিছুটা মুক্তির স্বাদ পায়।

এখানে উল্লেখ্য, আত্মিক যোগসূত্রতাই আত্মীয়তার লক্ষণ। মানবিক স্তরে ভাবের আদান-প্রদান হল আত্মীয়তার অঙ্গ। এই পারস্পরিক

আত্মীয়তা প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তি-মানুষের আত্মিকতার মাপকাঠি। ভারতীয় সভ্যতার মূল উপাদান গ্রামীণ সংস্কৃতি আত্মীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মীয়তা-বোধ প্রাথমিক স্তরে মনুষ্যত্বের লক্ষণ; এই মনুষ্যত্ব-বোধই সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস বা প্রত্যয়। এই বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের অভাব থাকলে নিজে থেকে কিছু গড়ে তোলা যায় না। আমাদের মঙ্গলবিধান রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এ-ধারণা ত্যাগ করে আমাদের নিজেদের আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে হবে, তবেই গড়ে উঠবে ভারতের আদর্শনিষ্ঠ সমাজ।

তৃতীয়ত,—স্বধর্ম পালন অবশ্য-কৃত্যের মধ্যে পড়ে। ব্যক্তি-মানুষের সহজাত শুদ্ধ সংস্কার অবশ্য-কৃত্যের নিয়ামক ও নির্ধারক। সহজাত শুদ্ধ-সংস্কার ধরতে পারলে ব্যক্তিসত্তা হিসাবে মানুষ তার কী করণীয় তার অনেকখানি জানতে পারে। আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় 'ট্রাজেডি' হল আমরা কী তা আমরা জানি না, আমাদের কী করণীয় তাও আমরা জানি না। আমাদের জীবনের চলার পথে বিভিন্ন পরিবেশে নানা ঘটনার মোকাবিলা করাটাই যেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য—উভয় চিন্তার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হল 'বুদ্ধি' ও 'ধর্ম', এই দুটি শব্দ ও তাদের তাৎপর্য নিয়ে। পাশ্চাত্ত্য মতে অন্যান্য জীব থেকে মানুষের বিভেদক লক্ষণ হল বুদ্ধি। একটা চলতি কথা আছে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই মানুষকে আরিস্ততলের হাতে তুলে দিলেন তাকে বুদ্ধিমান করবার জন্য। তাই বুদ্ধিধর্মিতা হল পাশ্চাত্ত্য জগতে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। বুদ্ধির কর্ষণ ও উৎকর্ষ পাশ্চাত্ত্য জীবনের লক্ষ্য-বস্তু। এখানে উল্লেখ্য, বুদ্ধি চলে বৈকল্পিক ন্যায়ের ধারায়, বুদ্ধি চিন্তা-ক্ষেত্রে বৈপরীত্য আনে। ফলে, একটা বিশেষ স্তরে বুদ্ধি সংশয়াত্মক হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি যদি সুপথে চলে তবেই সে-বুদ্ধি মঙ্গলকর। কিন্তু এখানে স্মর্তব্য, প্রকৃতির রাজ্যে সর্বোচ্চ হলেও পাশ্চাত্ত্য মতে বুদ্ধি একটা মানসিক বৃত্তি। তাই তত্ত্বগত দিক থেকে এ-কথা বলা যায় যে, আত্মগত আলোকে স্বচ্ছ না হলে বুদ্ধির বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, বুদ্ধি মানুষকে মনের সীমিত গবাক্ষ থেকে জীবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে নিয়ে যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু জটিল রহস্য বুদ্ধির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়। তাই ভারতীয় ঋষিরা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হিসাবে মেনে নিলেও আত্মগত প্রজ্ঞার আলোকে শোধিত করে তাকে সাত্ত্বিকী করবার কথা বলে গেছেন। বুদ্ধি-ধর্মিতার মূল্য দিলেও প্রাচ্যের পথ ধর্মের পথ। মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে জৈবিক অংশে মানুষের অনেকখানি মিল থাকলেও ধর্ম-চেতনা মনুষ্যেতর জীব

থেকে মানুষকে আলাদা করেছে। অথবা বলা যেতে পারে, অন্যান্য জীব থেকে মানুষের বিভেদক লক্ষণ হল ধর্মবোধ, এবং এই ধর্মবোধই প্রাচ্য মতে মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই ধর্মবোধই মানুষকে দিতে পারে প্রকৃত অনুভব-শক্তি যার কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি শুদ্ধ সংস্কার সহযোগে ব্যক্তি মানুষকে স্বধর্মের ইঙ্গিত দেয়। এই স্বধর্ম পালনই অবশ্য-কৃত্য কর্ম। গীতায় শ্রীভগবান তাই বলেছেন, 'স্বধর্মমাপি চাবেক্ষ্য,' 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' প্রভৃতি বাক্য। তাই সম্ভবত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি বাল্যকালেই অনুভব করেছিলেন তাঁর জীবন চালকলা-বাঁধা পুরোহিত-তন্ত্রকে সেবা করবার জন্য নয়, 'বহুজনহিতায়', 'বহুজনসুখায়' তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। স্বধর্ম-বোধই একদিকে যেমন ভারতীয় বর্ণভিত্তিক সমাজের ভিত্তি, অপর দিকে ব্যক্তি-চেতনার উৎসস্থল। এই স্বধর্ম-চেতনাই মানুষের মনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংশয়, অহেতুক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ভাবসকল দূর করে। ধর্মই তখন কর্মে রূপান্তরিত হয় বা কর্মই ৩৩ তখন ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মনে তখন ন্যায়, অন্যায়, ঔচিত্য, অনৌচিত্য, সৎ, অসৎ প্রভৃতি প্রশ্ন দেখা দেয়। নৈতিক জীবনের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ তখন তার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। নৈতিক বা ধর্মপথই ভারতের নিজস্ব পথ। এই পথ দীর্ঘদিন তামসিকতার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মাচার্য তাৎ-কালিক ভারতের আধিকারিক পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বধর্ম পালন করে জীবনের অধ্যাত্ম মূল্যায়ন ও আচরণের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বধর্মের কথা, স্বাজাত্যের কথা, স্বাতন্ত্র্যের কথা, ভারতীয়তার কথা সাধনার মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী ধারায় নতুন করে শোনালেন। বৃত্তাকারে এ-সাধনার সূচনা হয়েছিল হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম থেকে, ত্রিভুজাকারে ঐ সাধনা কেন্দ্রীভূত হল দক্ষিণেশ্বরের জঙ্গলে, অষ্টসখীর এক সখী রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত মা ভবতারিণীকে কেন্দ্র করে; স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের মধ্য দিয়ে ঐ সাধনা ব্যাপ্ত হল ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে। ঐ সাধন-শক্তিই আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আজ বিশ্বে ভাস্বর।

রামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন বিশেষ একটা যুগে, বিশেষ একটা পরিবেশে। তাৎকালিক সামাজিক ও ধর্মক্ষেত্রে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তার একটা সমাধান-সূত্র বের করেছিলেন; নিজে আচরণ করে তিনি জনমানসে একটা প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। এখন প্রশ্ন, ঐ প্রভাব কি সমকালীন কোন ব্যাপার, না, রামকৃষ্ণের বাণী সর্বকালীন?

রামকৃষ্ণের বাণী মানবতার বাণী, মুক্তির নির্দেশ, স্ব-ধর্মে ও স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার কথা। যতদিন প্রাণ ধারণের উপযোগী জল, বায়ু, তাপ প্রভৃতি উপাদানসকল থাকবে, অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবী থাকবে, যতদিন মানবসমাজ থাকবে, যতদিন মন নামে একটা পদার্থ থাকবে ততদিন মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসাও থাকবে; অতএব, রামকৃষ্ণ ও তাঁর কথাও থাকবে। এ-জিজ্ঞাসা এক দিকে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে জাগতিক সম্পদকে মানবকল্যাণের কাজে লাগায়, অন্য দিকে এ-জিজ্ঞাসা ব্যবহার-ভূমিতে সমাজের মূলসূত্রে গাঁথা ধর্ম-জিজ্ঞাসা। সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর করে সমাজকে সংহতির পথে চালিত করে; এবং পরিণামে এ-জিজ্ঞাসা মুক্তির পথের নির্দেশ দেয়। এরই জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষরা আমাদের মধ্যে আসেন। পুণ্যভূমি ভারতের মাটিতে মানবতার প্রতিমূর্তি বুদ্ধ এসেছেন, সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ শংকর এসেছেন, আরও অনেকে এসেছেন। বর্তমান যুগে মানব-দরদী অধ্যাত্ম-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। ব্যবহার-ভূমিতে তিনি শোনালেন 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'র কথা, ধর্মক্ষেত্রে তিনি আবিষ্কার করলেন 'যত মত, তত পথ', আর পরিণামে সাধকদের জন্য তিনি রেখে গেলেন তাঁর উপলব্ধিগত অধ্যাত্ম সম্পদ 'ভাব মুখে থাক'। এ-বাণী চিরন্তন, শাশ্বত অর্থাৎ সর্বকালের সর্বদেশের মানবতার বাণী।

"হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ···বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর আমায় মানুষ কর॥"

বিবেকানন্দ (বর্তমান ভারত)

পরিশিষ্ট

দ্রষ্টব্য

১. বর্তমান গ্রন্থে 'রামকৃষ্ণ ফেনোমেনন'—শব্দটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. 'ন পরিনম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে'—যার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়, যা অনড় নয়, সদা চঞ্চল, তাকেই আমরা সাধারণভাবে প্রকৃতি বলি।

৩. প্রারব্ধ জীবের কর্মসংস্কার-জাত, এবং জীবের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের সঙ্গে জড়িত। জীবের জাতি, আয়ু, ভোগ প্রারব্ধ নির্ধারিত।

প্রারব্ধ বা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

কর্ম ও জন্মান্তরবাদ বা প্রারব্ধ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একমাত্র জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায় ছাড়া প্রতিটি-ভারতীয় সম্প্রদায় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন।

জীবের জন্ম, জাতি, কুল ও স্বভাব জৈনমতে সবই কর্ম-নির্ধারিত। কর্ম অনুসারেই পরবর্তী জন্ম হয়। জৈন-তীর্থংকরদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলবার ক্ষমতা ছিল।

বৌদ্ধরা জীবের কর্মের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। কর্মভোগের জন্যই জীবের বার বার দেহ নিতে হয়। বুদ্ধের নিজের পূর্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত জাতক গ্রন্থে সংগৃহীত আছে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে নানা গুণ ছাড়াও আত্মায় অদৃষ্ট নামে একটি গুণ স্বীকৃত। ইহা অনুষ্ঠিত সৎ ও অসৎ কর্মের সংস্কার বিশেষ। আত্মার দেহত্যাগ (অপ-সর্পণ) ও নতুন দেহ গ্রহণ (উপ-সর্পণ) অদৃষ্ট নির্ধারিত।

সাংখ্য-যোগ সম্প্রদায়ের মতে বিবেক জ্ঞান উদয় না হওয়া অবধি কৃতকর্মের ফলস্বরূপ প্রকৃতির আবর্তে জীব বার বার জন্ম নেয়।

মীমাংসকদের মতে প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই একটা অপূর্ব সৃষ্টি করে। সৎকর্মজাত অপূর্ব পুণ্য ও অসৎ কর্ম-জনিত কর্ম পাপ বলে অভিহিত হয়। পুণ্য ও পাপের ফলেই জীব যথাসময়ে উপযুক্ত শরীর ধারণ করে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। স্বর্গলাভের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন স্তরে জীবকে নানা দেহান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

উপনিষদ ও গীতায় 'জন্মান্তরবাদ' সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 'এই দেহ ধারণ করিবার পূর্বে আমি আরও অনেক দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছি'—একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন। যাঁরা যোগশক্তি বা তপশক্তির প্রভাবে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন তাঁদের জাতিস্মর বলা হয়। ভারতীয় চিন্তায় জাতিস্মরের উল্লেখ আছে। তাছাড়া বর্তমান জন্ম ও অব্যবহিত-পূর্ব ও পর তিন জন্ম ভৃগু গণনা মতে স্বীকৃত।

অদ্বৈত বেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত প্রভৃতি নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিটি মতবাদেই জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত।

শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়সকল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জন্মের ক্রম অনুসারে জীব নানা দেহান্তর বা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। স্থূল দেহ-বিশিষ্ট সংসারাবদ্ধ জীব 'স-কল' নামে অভিহিত হয়। এ-অবস্থায় জীব তার কর্মানুসারে স্ব স্ব তত্ত্ব ও ভুবন অনুযায়ী দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি লাভ করে। পরবর্তী ধাপ 'প্রলয়-কল', এ-অবস্থায় জীব সমস্ত সৃষ্টিকারী তত্ত্ব থেকে মুক্ত থাকে, ঐ সকল জীবের কোন দেহবোধ থাকে না। ঐ-সকল জীব কর্ম সংস্কার ও মূল অবিদ্যায় যুক্ত কতকগুলি অণু। জীবের সর্বোচ্চ স্তর হল 'বিজ্ঞান-কল'

—এ অবস্থায় জীব প্রকৃতি মায়ার গণ্ডী পেরিয়ে শুদ্ধ মায়ায় বা মায়ার জগতে অবস্থান করে। এ-অবস্থা কৈবল্যের অবস্থা ; ঐ সকল জীব পরবর্তী কল্পে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভের যোগ্য হয়। শিবাবস্থায়ও নানা অবস্থান্তরের কথা শৈব-শাক্ত মতবাদে পাওয়া যায়। নানা স্তরে অবস্থানের তারতম্য অনুসারে নানা জীবাত্মা—১) বিদ্যেশ্বর ২) মন্ত্রেশ্বর ও ৩) লোকেশ্বর নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শৈব-শাক্ত আগমসকলে বর্ণিত জন্মান্তর ও আত্মার ত্রিবিধ অবস্থান্তর প্রাচীন গ্রীক চিন্তায় বিশেষভাবে ওরফাইট (Orphite) ও তাদের পূর্ববর্তী ওরফিসি (Orphici)-র অনুরূপ। প্লাতোর দার্শনিক চিন্তায় আত্মার বিভিন্ন অবস্থান্তরেব কথা বর্ণিত আছে।

খ্রীষ্ট, ইসলাম, ও ইহুদী প্রভৃতি সেমিটিক ধর্মসকলে জন্মান্তববাদ স্বীকৃত হয় নি।

৪. মায়িক, কার্মিক ও আণব—বদ্ধ জীব এই তিনটি মল বদ্ধ। আণব শব্দটি অণু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। আণব মল ও বেদান্তের মূল অবিদ্যা শব্দ দুটি সমার্থ-বোধক। মানুষ স্বরূপত মুক্ত হয়েও আণব মল জন্য দেশ-কালের গণ্ডীতে বদ্ধ। মায়িক ও কার্মিক মল মুক্ত হলেও আণব মল জীবন্মুক্ত অবস্থায়ও থাকে। আণব মল-মুক্ত জীব শিব পদবাচ্য। আণব দুই প্রকার, আত্মার শুদ্ধ অহন্তার বিলোপ রূপে এক প্রকার এবং অনাত্মায় অশুদ্ধ অহন্তার আবির্ভাব রূপে দ্বিতীয় প্রকার। আত্মা থেকে স্বাতন্ত্র চলে যায় বোধ থাকে, বা বোধ চলে যায় স্বাতন্ত্র থাকে। মায়িক মলকে কখনও কখনও ভেদ বলা হয়েছে। এই ভেদের অর্থ ঐক্যের মধ্যে বহুর আবির্ভাব। ইহা মায়া ও তৎপ্রসূত একত্রিশটি তত্ত্ব দ্বারা গঠিত। কর্ম-মল হল অদৃষ্ট এবং পাপ-পুণ্যের নিয়ামক।

প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় (২১-২৮) ; সৌভাগ্য ভাস্কর (পৃঃ ৯৫) ; শিবসূত্র বার্তিক ১ম অধ্যায় (২-৩) ; শিবসূত্র বিমর্শিনী (১ম অধ্যায ২-৩)।

৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ), স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ৭৬।

৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ), স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ৯৮।

৭. উল্লেখ্য, গদাধরের মনের অবচেতন স্তরে দীর্ঘদিন তাঁদেব কৌলপরম্পরা-অনুসারী একটা পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ সাংসারিক জীবন যাপনের প্রতি আকর্ষণ ছিল, সে-সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন। কিন্তু মা জগদম্বার বিচিত্র লীলা কে বুঝতে পারে ?

৮. কলকাতার প্রায় ৪।৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বর, তৎকালে ঐ স্থানটি বৃক্ষাদি শোভিত এবং শক্তি সাধনার পক্ষে উপযোগী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের যে স্থানটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য রানী রাসমণি স্থির করেন, তার কিছুটা অংশ একজন খ্রীষ্টান সাহেবের, আর অবশিষ্টাংশ মুসলমানদের কবরখানা এবং গাজী সাহেবের পীরের জায়গা। স্থানটির আকার কূর্মের পৃষ্ঠের মত। শক্তি সাধনার পক্ষে কূর্ম পৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানভূমি তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট বিধি।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, সিদ্ধেশরী-কালী-প্রসিদ্ধ হালিসহরের বলিদাঘাটের নিকট রানী রাসমণির পিতৃগৃহ। সেখানে ভাগীরথী তীরে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালীকে আশ্রয় করে মা ভবতারিণীকে প্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রথমে সঙ্কল্প করেন। শোনা যায় ব্রাহ্মণপ্রধান কুমারহট্টের (হালিসহরের) গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজপতিগণ রানী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধিতা করেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণের আধিপত্য এত বেশী ছিল যে, সারা হালিসহর পরগনার গঙ্গাতীরে যে কোন পরিমাণ টাকার বিনিময়ে রাসমণি জমি সংগ্রহ করতে পারলেন না। সেইহেতু তিনি শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

শক্তিপীঠ সম্পর্কে এখানে আরও বলা যায়, সাধক রামপ্রসাদ শক্তিসাধনার জন্ম কুমার-হট্টর হালিসহরে শক্তি সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করে একনিষ্ঠ সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন।

সাধক কমলাকান্তের আরাধ্যা ছিলেন দেবী বিশালাক্ষ্মী। বর্ধমান জেলায় চান্না গ্রামে এখনও তাঁর সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্ডির অসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ত্রিমুণ্ডির আসনযুক্ত কমলাকান্তের আর একটা সাধনপীঠ কোটালহাটে পাওয়া যায়।

শক্তিসাধক রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন নাটোরের রানী ভবানীর দত্তক পুত্র। তিনি তন্ত্রসাধনা করেন এবং কাটোয়ার ৮।৯ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে জিরেনপুর গ্রামে সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তা-ছাড়াও বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় পাঁচটি সিদ্ধ শক্তিপীঠ এখনও বাংলার তন্ত্রসাধনা তথা মাতৃসাধনার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

৯. প্রতিটি জীবের মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। উমাপতি শিবাচার্য স্বতন্ত্র তন্ত্রের একটি কারিকার ভাষ্যে যে টীকা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা আছে "কুণ্ডলিনী শব্দ বাচ্যস্ত্র ভুজঙ্গ কুটিলাকারেন নাদাত্মনা স্ব কার্য্যেন প্রতি পুরুষং ভেদেনাঽবস্থিতো, নতু স্বরূপেন প্রতি-পুরুষমবস্থিত।" মূল শ্লোকটি হল,—

'যথা কুণ্ডলিনী শক্তির্মায়া কর্মানুসারিনী
নাদ বিন্দ্যাদিকং কার্য্যং তন্ত্রা ইতি জগৎ স্থিতিঃ।'

ইহজন্মে এবং পূর্বজন্ম ও জন্মান্তরে জীবের যত মানসিক ভাব ও পরিবর্তন দেখা যায় সে সকলের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিমূর্তি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণা শক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ কুণ্ডলিনী আখ্যা দিয়েছেন। বদ্ধজীবে কুণ্ডলিনী শক্তি একেবারে সুপ্ত থাকে। ঐ শক্তির সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয় হয়। সাধনার সাহায্যে ঐ শক্তি যদি কোনও ভাবে জাগ্রত হয়, তবে ঐ শক্তির প্রভাবে জীব পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে এবং শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়। কুণ্ডলিনীশক্তি সাধারণ ভাবে জীবদেহে সুপ্ত হলেও বাইরের রূপ-রসাদির স্পর্শে ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে ঐ শক্তি নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করে তার ফলেই জীবের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী হলেও চেতনার উদয় হয়। কারণ, কুণ্ডলিনী শক্তি জীবদেহে প্রাণ-কুণ্ডলিনী রূপে কার্য্যকর।

মস্তিষ্ক-মধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ আকাশ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা বা শ্রীভগবানের জ্ঞান-স্বরূপে অবস্থান ক্ষেত্র, তার প্রতি কুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষ আকর্ষণ বা শ্রীভগবান তাকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে। কিন্তু জাগ্রত না থাকায় কুণ্ডলিনী শক্তি সে আকর্ষণ অনুভব করে না। জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তি ঐদিকে ধাবিত হয় এবং শ্রীভগবানের নিকটস্থ হয়। নিকটস্থ হওয়ার পথও মানবদেহে বর্তমান। ঈশ্বর লাভ একমাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব, কারণ, মানুষের দেহের গঠনই এমন যে একমাত্র মানব দেহেই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হতে পারে। মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে মূলাধার নামীয় চক্র পর্যন্ত এসেছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত সুষুম্নাবর্ত। ঐ পথ দিয়েই কুণ্ডলিনী শক্তি পূর্বে পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে মূলাধারে এসে নিদ্রিতা থাকে। ঐ পথ দিয়েই আবার উহা মেরুদণ্ডস্থিত ছয়টি চক্র পার হয়ে অবশেষে মস্তিষ্কে এসে উপস্থিত হয়। ঐ ছয়টি চক্রের নাম ও অবস্থান স্থল হ'ল যথাক্রমে, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ (১) মূলাধার, (২) তদূর্ধ্বে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, (৩) তদূর্ধ্বে নাভিস্থলে মণিপুর, (৪) তদূর্ধ্বে হৃদয়ে অনাহত, (৫) তদূর্ধ্বে কণ্ঠে বিশুদ্ধ, (৬) তদূর্ধ্বে ভ্রু-মধ্যে অজ্ঞাচক্র। এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথেই বর্তমান। অতএব,

হৃদয়, কণ্ঠ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তদ্বিপরীত অবস্থিত মেরু-মধ্যস্থল বুঝতে হবে। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে এক চক্র থেকে অন্য চক্রে যেমন এসে উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব উপলব্ধি হতে থাকে এবং ঐ-ভাবে যখনই উহা আজ্ঞাচক্র ভেদ করে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয় তখনই পরমাত্মার সাথে তন্ময়তা আসে।

কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে ওঠবার কালে যে সকল অনুভব হয় শাস্ত্রে সে ভাবের পাঁচটা গতির কথা বলা আছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণও সেকথা বলে গেছেন, (১) পিপীলিকা গতি, (২) ভেক গতি, (৩) সর্প গতি, (৪) পক্ষী গতি, (৫) বাঁদর গতি।

তা-ছাড়াও প্রতিটি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয়, সে বিষয়ে ঠাকুর বলেছেন, "বেদান্তে আছে সপ্ত ভূমিকার কথা, এক একটা ভূমিকায় এক এক রকম দর্শন হয়। নীচের তিন ভূমিতে মনের ওঠা, নামা, ঐ দিকের দৃষ্টি খাওয়া, পরা, রমন···ইত্যাদি। ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে ওঠে তো তখন তার জ্যোতি দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কখন কখন উঠলেও মন আবার পূর্বোক্ত তিন ভূমি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারও মন কণ্ঠে ওঠে তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা যেমন বিষয়ের কথা, কইতে পারে না। ঠাকুরের নিজের জীবনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যেতে পাবে। কণ্ঠ ছাড়িয়ে কারো মন যদি ভ্রূ-মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) ওঠে তো তার আর পতনের ভয় থাকে না। তখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধক নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। আজ্ঞাচক্রের আর সহস্রার মাঝে একটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ পর্দামাত্র আড়াল আছে। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় সাধক যেন পরমাত্মার সঙ্গে মিশে গেছে, এক হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও এক হয় নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্য্যন্ত নামে, তার নীচে আর নামতে পারে না। জীব-কোটিরা এখান থেকে আর নামেন না। একুশ দিন নিরন্তর সমাধিস্থ থাকার পর ঐ আড়ালটা ভেদ হয়ে যায়। আর সাধক পরমাত্মায় একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে ওঠা।

১০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (ষষ্ঠ অধ্যায়) স্বামী সারদানন্দ।

১১. শংকর মতে (বেদান্ত মতে) শক্তির বাস্তব সত্তা নাই—পারমার্থিক দৃষ্টিতে শক্তি তুচ্ছ, বিচার দৃষ্টিতে শক্তি অনির্বচনীয় বা মিথ্যা এবং ব্যবহার দৃষ্টিতে শক্তি সত্য। সুতরাং শংকর প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদে শক্তির স্থান নাই। শক্তির পারমার্থিকতা অস্বীকার করার ফলে জীব ও জগৎ উভয়ই মিথ্যারূপে উপেক্ষিত হয়েছে। কর্ম, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির বাস্তবিকতা নিরস্ত হয়েছে। সম্বন্ধ ও সম্বন্ধাত্মক জ্ঞান মায়িক বলে অনাদৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন, এ কোন্ শক্তি? উত্তরে বলা যায়, এ-শক্তি মায়া শক্তি। কিন্তু তন্ত্র ও আগমে মায়া শক্তির উর্ধ্বে চিতি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, এই চিতিশক্তিই চৈতন্য স্বরূপিনী, শিবের স্বরূপ মহিমা। বলা বাহুল্য, ভক্তিমার্গে শক্তির সত্তা স্বীকৃত। শক্তির বিশুদ্ধ ও নির্মল স্বরূপ স্বীকার না করলে ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সবই অজ্ঞান-কল্পিত বলে হেয় হয়ে পড়ে। ভক্তি, করুণা, কর্ম, প্রভৃতির উৎস শুষ্ক হয়ে যায়। শৈব, বৈষ্ণব, কিংবা শাক্ত আগমে যে অদ্বৈতবাদ আছে তা ভক্তিসাধনা বা রসাস্বাদনের পরিপন্থী নয় কারণ, তা শক্তি-ত্যাগ মূলক নয়, শক্তিগ্রহণ মূলক। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়েও সেজন্য প্রজ্ঞাপারমিতার সত্তা অঙ্গীকার করে বোধিসত্ত্ব বাদের ভিত্তি পত্তন হয়েছে। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ শক্তি ও শক্তিমানের সমন্বয়মূলক। উভয়ের সমন্বয় বা অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থাপন করে প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যগন নিষ্ক্রিয় বা অব্যক্ত-অবস্থাতেও শক্তির সত্তা স্বীকার করেন।

শক্তি,—ভগবানে বিলীন মহাশক্তি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় উন্মেচিত হয়। অব্যক্তদশাতে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ থাকলেও তার প্রতীতি থাকে না। একে এক প্রকার নির্বাত, স্পন্দনরহিত নির্বান অবস্থা বলে বর্ণনা করা যায়। যে সংকল্প-নিবন্ধন প্রসুপ্তা মহাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় তা ভগবানের অনির্বচনীয় স্বাতন্ত্র, ভগবানের স্বভাব। এই উদ্বোধন-কালে লেশমাত্র শক্তির উন্মেষ হয়, বাকী সমগ্র শক্তিই অব্যক্ত থাকে। অভিব্যক্ত শক্তি ক্রিয়া ও ভূতি ভেদে দুই প্রকার। আইর্বুধ্যসংহিতাতে ক্রিয়া শক্তিকে সৌদর্শিনী কলা বলা হয়েছে। ইহা নিষ্কল ও প্রাণাত্মক। নানাপ্রকার ভেদসম্পন্না ক্রিয়া-শক্তির তুলনায় ভূতি শক্তিসকল অতি ক্ষুদ্র। ভূতির পরিবর্তনাদি সকল ব্যাপারই ক্রিয়া সাপেক্ষ। এই ক্রিয়া শক্তিই সৃষ্টিকালে মূলা প্রকৃতিতে পরিণাম সামর্থ, কালে কলন সামর্থ এবং আত্মায় ভোগ সামর্থ সঞ্চার করে, এবং সংহারকালে ঐ সকল সামর্থ প্রত্যাকর্ষণ করে।

১২. ভক্তিসাধনার দৃষ্টিকোন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হবে।

ভারতবর্ষে চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে চারিটি ধারায় চলে আসছে। প্রথমটি 'শ্রী' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈত ; শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতের প্রধান প্রবক্তা।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় সনকাদি প্রবর্তিত 'হংস' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদি নামে প্রসিদ্ধ। প্রধান প্রচারক হলেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য।

তৃতীয়টি দ্বৈতমতাবলম্বী ব্রহ্ম সম্প্রদায়। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য এই মতের প্রধান আচার্য্য।

চতুর্থ সম্প্রদায়ের নামান্তর রুদ্র সম্প্রদায়, আদি গুরু রুদ্রদেব। এই মতের সিদ্ধান্ত শুদ্ধাদ্বৈত এবং প্রধান প্রচারক বিষ্ণুস্বামী ও পরবর্তীকালে বল্লভাচার্য্য। বলা বাহুল্য চৈতন্যদেবের নামানুসারে কোন স্বতন্ত্র মতবাদ নাই। সাধারণত মাধ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গণনা হয়ে থাকে। গুরু-পরম্পরা আলোচনা করলেও তাই জানা যায়। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী ও সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু মাধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক অভিমতের ঐক্য নাই। এমন কি উভয়ের উপাসনা প্রণালী ও আদর্শভেদও নানা দিক থেকে দেখা যায়।

গৌড়ীয় মতের মূল অন্বেষণ করলে দেখা যায় পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র, শাক্ততন্ত্র ও মহাযানাদি বৌদ্ধ সাধন প্রণালী থেকে বহু তত্ত্ব গৌড়ীয় আচার্যগণ স্বকীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে নিয়েছেন। সে সবই আগমের অন্তর্গত। সুতরাং গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের মূলে যে আগমের প্রাধান্য রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতধর্ম মূলত ভক্তি প্রধান। বৈদিক সাহিত্যে ভক্তির চর্চা অতি বিরল।

শ্রী-সম্প্রদায় মতে জ্ঞান ও কর্ম অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির দ্বার মাত্র। ভক্তিই উপায়। (২) ভক্তিযোগে অভ্যস্ত হলে ক্রমশ পরমভক্তির উদয় হয়। পরাভক্তি বস্তুত ধ্যানেরই পরিপক অবস্থা বিশেষ। এই সময়ে চিত্তে যারপর নাই প্রীতির আবির্ভাব হয়, অন্য কোন বস্তুতে প্রয়োজন বোধ থাকে না এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এ অবস্থা জ্ঞানেরই একটা ভূমিকা। (৩) পরাভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র সাধন।

পরাভক্তির পর পারজ্ঞান বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের উদয় হয়। (৪) ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর ঐ পরাভক্তি থেকে পরম ভক্তির আবির্ভাব হয়। পূর্বোক্ত ঐ পরম ভক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ প্রাপ্তি।

পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্ম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—এই পাঁচ প্রকার যোগের উল্লেখ আছে। কর্মযোগের দুটি অংশ—প্রথমটি যজ্ঞ-দানাদি কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেহশুদ্ধি। আর যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনাই কর্মযোগের দ্বিতীয়াংশ। কর্মযোগ ঐশ্বর্য প্রধান; এথেকে ঐশ্বর্য্য ও কামের প্রাপ্তি হয়। কর্মযোগের অনুষ্ঠানফলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞানযোগ কৈবল্যদায়িনী। জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগের সহকারী। প্রারব্ধ কর্মের অবসান পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ অভ্যাস যোগের দ্বারা অনুভবের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি প্রবাহকে অপরোক্ষতা সম্পন্ন করাই ভক্তিযোগ। জ্ঞানযুক্ত ভক্তিযোগে যার সামর্থ্য নাই, তার পক্ষে প্রপত্তিযোগ আশু ফলপ্রদ হয়।

প্রপত্তিযোগের দুরকম ভেদ আছে, আর্ত ও দৃপ্ত।

যিনি ভগবানের অহেতুক কৃপা লাভ করে সদগুরুর আশ্রয় নেন ও তাঁর উপদেশ নিয়ে শাস্ত্রের অভ্যাস ও শ্রবণাদি দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন এবং সর্বদা ভগবানের অনুসন্ধানে তৎপর থাকেন, তিনি আর্ত-প্রপন্ন। যিনি নিজের সমস্ত ভার ভগবৎ পদে অর্পণ করে নিশ্চিন্তভাবে তাঁর আশ্রিতরূপে অবস্থান করেন তিনি দৃপ্ত-প্রপন্ন।

প্রপত্তি অপেক্ষা সুলভ উপায় হল আচার্য্যাভিমান। জীবোদ্ধারই যে গুরুর দেহধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও তাঁর আদেশ পালন হল আচার্য্যাভিমান। স্বতন্ত্র ভাবে আচার্য্যাভিমান পুরুষার্থ লাভের উপায় এবং অন্যান্য উপায়ের সহকারীভাবে এর উপায়ত্ব আছে।

আমরা বলেছি সাধক রামকৃষ্ণের সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, প্রকাশ জ্ঞানে এবং সিদ্ধি ক্রিয়ায়। পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় কর্ম জ্ঞানের পথ খুলে দেয় এবং জ্ঞান পরিণামে ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অনুভব নিয়ে রামকৃষ্ণদেব সাধনা আরম্ভ করেছিলেন, সে অনুভবের মূলে ছিল ভক্তি এবং সেই ভক্তিই তাঁকে জ্ঞানের পথে নিয়ে গিয়ে অদ্বৈত সাধনার নির্বিকল্প স্তরে উন্নীত করে এবং সেই স্তর থেকে তিনি আবার ভক্তির পথে প্রতিষ্ঠ হন এবং নিঃস্বার্থ কর্মের নির্দেশ পান। 'ভাবমুখে' থেকে তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্য ও গৃহী-ভক্তদের মধ্য দিয়ে কর্ম করে যান এবং জনসমাজকে নতুন ভাব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। শক্তি সাধনা ছাড়া কোন সাধনাই পূর্ণতার পথে যেতে পারে না—তাই ঠাকুর তন্ত্র সাধনায় অভিষিক্ত হয়ে দিব্যস্তরে উন্নীত হন এবং বেদান্ত-বর্ণিত সপ্তম ভূমিকায় আরূঢ় হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সাধনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, সাধনার ক্ষেত্রে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের পথে কোন বিরোধ নেই, বিরোধ যেটা দেখা যায় তা আচরণ ক্ষেত্রে।

সাধারণ ভাবে দেখা যায় সর্বক্ষণ ভগবৎ চিন্তা করলে মন ভগবানের রূপ নেয় বা মনে সর্বদাই ভগবানের রূপ ভাসমান থাকে। মনের বৃত্তি হল অনিমিত্ত এবং যত্ন ভিন্ন স্বতই উৎপন্ন হয় বলে স্বাভাবিকী। তাছাড়াও ভগবৎ চিন্তায় মনে প্রীতির উদয় হয়, এখানে কোন জন্যত্ব নেই। মনের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিও অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী। কারণ, মন-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়াদির কোন স্বতন্ত্র ক্রিয়া নেই। মন ও ইন্দ্রিয়াদির ভাগবত বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির জন্য প্রীতিই হল ভক্তি।

সেবার্থক 'ভজ'-ধাতু থেকে ভক্তি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ভগবদ্-সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ

সেবাই ভক্তি। বৃত্তিই প্রীতিরূপে পরিণত হয়। ফলে, বৃত্তি, প্রীতি, সেবা ও ভক্তি তুল্যার্থক শব্দ। প্রীতিই বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রেম নামে আভিহিত হয়ে থাকে। ভক্তি ক্ষেত্রে দ্বৈতাকারে উপাস্য-উপাসক ভাব বর্তমান, যার ফলে নির্গুণ জ্ঞানের উপযোগী বিবেক সেখানে উৎপন্ন হয় না। প্রাথমিক স্তরে ভক্তিই জ্ঞানের জননী কিন্তু, জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করলে ভক্তির কোন ভূমিকা থাকে না, ঐ অবস্থায় 'শিবোঽহম্'-জীব শিব হয়ে যায়। কৌল সাধক পরা শক্তি বিষয়ে ঐ প্রকারে ভক্তির সাহায্যে কৌল জ্ঞান লাভ করতে পারেন, অন্য কোন উপায়ে নয়। ঈশ্বর বিষয়ক গভীর অনুরাগের নাম পরাভক্তি ; বা, পরা ভক্তির নাম অনুরক্তি। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায় ভক্তি দুই প্রকার—পরা ও অপরা। জ্ঞান যেমন যত্নের অপেক্ষা রাখে না, সেইরূপ পরাভক্তিও বৃত্তি বা যত্নের অপেক্ষা রাখে না। এ-জন্য অনেকের মতে পরাভক্তি ক্রিয়ারূপা নয়, অন্যদিকে অপরাভক্তি ক্রিয়ারূপা।

আমরা পূর্বেই বলেছি, সেবার্থক 'ভজ'-ধাতু থেকে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব, সেবাই ভক্তির প্রধান সাধন। সেবা হল কৃতি বা প্রযত্ন বিশেষ। অনুরাগ না জন্মিলে সেবাও হতে পারে না। উপাস্য দেবতার প্রতি অনুরাগ জন্মে বলেই তাঁর সেবায় প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু এই অনুরাগে কামনা থাকে বলে পরাভক্তি যোগীরা এই অনুরাগকে প্রকৃত ভক্তি আখ্যা দেন না, ভক্তির আভাস বলেন। কামনাশূন্য একতান অনুরাগ হল পরাভক্তি। অপরাভক্তির চরম অবস্থায় জ্ঞান—এবং জ্ঞানের চরম অবস্থায় মুক্তি লাভ হয়। ভক্তির সাহায্যে উপাস্য দেবতার সালোক্য, অর্থাৎ উপাস্য দেবতা যে লোকে অবস্থান করেন, মৃত্যুর পরে সেই লোকে অবস্থান; সারূপ্য অর্থাৎ উপাস্য দেবতার যে রূপ, সেই রূপ ভক্ত লাভ করে।

উপাসনা—'উপ'-উপসর্গ যোগে 'আস'-ধাতু থেকে উপাসনা পদ সিদ্ধ হয়েছে। উপ= সমীপে; আস=অবস্থান। যে ক্রিয়ার দ্বারা ভগবদ্ সমীপে অবস্থান, অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য লাভ করা যায়, তার নাম 'উপাসনা'।

১৩. যোগেশ্বরী—পূর্ববঙ্গের কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তিনি বিদুষী এবং রূপে, গুণে অসামান্যা ছিলেন। দুর্জয় সাহস ও অধ্যাত্ম সাধনায় অসাধারণ দক্ষতা না থাকলে তন্ত্রোক্ত ভৈরবী হওয়া যায় না। মথুরবাবু স্থূল দৃষ্টিতে প্রথমে যোগেশ্বরীকে সন্দেহ করেন এবং তাঁকে তাঁর ভৈরব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ভৈরবী স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর পায়ের তলায় ভৈরবকে দেখিয়ে দেন। মথুরবাবু ঐ ভৈরবকে অচল আখ্যা দেন। ভৈরবী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, অচল ভৈরবকে তিনি সচল করতে পারেন। যোগ্য সাধিকার কথা। মথুরবাবু লজ্জায় মাথা নোয়ান এবং স্তব্ধ হয়ে যান।

সাধনায় ভৈরবী বিশেষ উন্নতা ছিলেন। যোগবলে তিনি জেনেছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রমুখ তিন জন সাধককে তন্ত্র সাধনায় সহায়তা করতে হবে। তাঁদের কাছে যোগেশ্বরী নিজেই গিয়ে হাজির হন, এবং তাঁদের চিনতে তাঁর এতটুকু অসুবিধা হয় নি। অপর দুজন সাধকের নাম চন্দ্র ও গিরিজা—তাঁদের বাস ছিল পূর্ববঙ্গে।

ব্রাহ্মণী যে অতি উচ্চ স্তরের সাধিকা ছিলেন তার বড় প্রমাণ ঠাকুর স্বয়ং। দেবাদিষ্ট হয়ে ঠাকুরের তন্ত্র সাধনার গুরুরূপে মনোনীত হওয়াই তাঁর সাধনার পরিচয়। ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীর ভাবের সাধিকা ছিলেন—ভৈরবী সাধনাই অবশ্য বীর ভাবের সাধনা। পশু, বীর ও দিব্য—এই তিন ভাবের সাধনার কথা তন্ত্রে বলা আছে। দিব্যভাব সর্বোচ্চ ভাব।

পরবর্তী কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবশ্য নিজেই ব্রাহ্মণীকে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিব্যভাবে উন্নীত করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর যোগেশ্বরী জপ, ধ্যান করে কাশীর চৌষট্টি যোগিনী

নামক পল্লীতে বাস করতেন। ঠাকুর সেখানে কয়েকবার যান। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যোগদা নামে আর একটি সাধিকাও ছিলেন। ঐ সাধিকার ভক্তি-বিশ্বাস দেখে ঠাকুর খুব তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর বৃন্দাবনে থাকবার নির্দেশ দেন। ব্রাহ্মণী বৃন্দাবনে গিয়ে অল্প কিছুদিন থাকবার পর সেখানেই দেহ রাখেন।

১৪. তোড়ল তন্ত্রে ৬৪-খানা তন্ত্রের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে এই নাম-সূচী নব যুগের মত বলে গ্রহণ করা চলে।

১) কালী ২) মুণ্ডমালা ৩) তারা ৪) নির্বাণ ৫) শিবসার ৬) বীর ৭) নিদর্শন ৮) লতাচন ৯) তোড়ল ১০) নীল, ১১) রাধা, ১২) বিদ্যাসার, ১৩) ভৈরব, ১৪) ভৈরবী, ১৫) সিদ্ধেশ্বর, ১৬) মাতৃভেদ, ১৭) সময়া, ১৮) গুপ্ত-সাধন ১৯) মায়া ২০) মহামায়া ২১) অক্ষয়া ২২) কুমারী ২৩) কুলার্ণব ২৪) কালিকা-কুলসর্বস্ব ২৫) কালিকা-কল্প ২৬) বারাহী ২৭) যোগিনী ২৮) যোগিনী-হৃদয়, ২৯) সনৎকুমার, ৩০) ত্রিপুরাসার ৩১) যোগিনী-বিজয় ৩২) মালিনী ৩৩) কুক্কুট ৩৪) শ্রীগণেশ ৩৫) ভূত ৩৬) উড্ডীশ ৩৭) কাম-ধেনু ৩৮) উত্তম ৩৯) বীরভদ্র ৪০) বামকেশ্বর ৪১) কুলচূড়ামণি, ৪২) ভাবচূড়ামণি ৪৩) জ্ঞানার্ণব ৪৪) বরদা, ৪৫) তন্ত্রচিন্তামণি ৪৬) বাণীবিলাস ৪৭) হংসতন্ত্র ৪৮) চিদম্বরতন্ত্র ৪৯) ফেৎকারিণী ৫০) নিত্যা ৫১) উত্তর ৫২) নারায়ণী ৫৩) ঊর্ধ্বাম্নায়, ৫৪) জ্ঞানদীপ ৫৫) গৌতমীয় ৫৬) নিরুত্তর ৫৭) গর্জন ৫৮) কুব্জিকা, ৫৯) তন্ত্র-মুক্তাবলী, ৬০) বৃহৎ শ্রীক্রম, ৬১) স্বতন্ত্র ৬২) যোনি ৬৩) কামাখ্যা…।

১৫. ব্রহ্মরন্ধ্রে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। যে সাধক যোগসাধনবলে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্মে শিব-শক্তি সামরস্য সম্পাদন করে তৎজনিত চন্দ্রমণ্ডল থেকে সুধাধারা পান করতে সমর্থ, তিনি মদ্যসাধক। যিনি রসনার দ্বারা উচ্চারিত বাক্যকে ভক্ষণ করতে বা বাকসংযম করতে পারেন, তিনি মাংস সাধক। যিনি সাধনার দ্বারা জীবদেহস্থ ইড়া পিঙ্গলা নাড়িতে প্রবাহিত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ করে মনকে নিশ্চল করতে পারেন, তিনি মৎস্য সাধক। যিনি সহস্রদল কমল-কর্ণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ জানতে পারেন তিনি মুদ্রা সাধক।

'র'-কার কুণ্ডলিনী শক্তি, ইনি দেহস্থিত কুণ্ডমধ্যে বা মূলাধারচক্রে অবস্থিত। 'ম'-কার পুরুষ, পরমাত্মা, পরমশিব। শাক্ত মতে ইনি মহাযোনি বা সহস্রদল কমল-কর্ণিকাগত ত্রিকোণমধ্যে অবস্থিত আছেন। 'আ'-কার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সম্পাদিত 'হংস'-রূপ অজপা মন্ত্র। 'র'-কার কুণ্ডলিনী শক্তি 'আ'-কার রূপে হংস আরোহণ করে, 'ম'-কাররূপ পরম শিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সামরস্য জনিত যে আনন্দ অনুভূত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের নিকট তাই হল পঞ্চ'ম'কারের মৈথুন। অধ্যাত্ম দিক থেকে যার ধারণা এত উচ্চ, ব্যবহার-ভূমিতে সচরাচর পঞ্চ'ম'-কারের যে ব্যাখ্যা আমরা পাই তা যে কতখানি আপত্তিকর ও ভ্রান্ত তা সহজেই বোঝা যায়।

১৬. লম্বা, চওড়া দশাসই পুরুষ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বছর ধ্যান, ধারণা ও অসঙ্গ বাস করার ফলে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তিনি সর্বদা অগ্নিসেবা করতেন। উগ্রতপা সন্ন্যাসী তোতাপুরী সারারাত ধ্যান, ধারণা ও সমাধিতে কাটাতেন। তোতাপুরী সম্ভবত পাঞ্জাব প্রদেশের কোন এক অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁর গুরুর বাস ছিল কুরুক্ষেত্রের নিকট কোন এক অঞ্চলে।

অতি শৈশব থেকেই তোতাপুরী সদাচার অভ্যাস করেন। যথাসময়ে যথারীতিতে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে গুরু-নির্দিষ্ট সাধনার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। সংসারের কোন প্রলোভনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। ফলে গোসাঁইজি নিজ পুরুষকার, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়কে সর্বেসর্বা বলে জেনেছিলেন। মন বেঁকে দাঁড়ালে ঐ পুরুষকার প্রবল প্রবাহের মুখে যে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায়, ঐ আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়ের উপর যে তখন ঘোর অনাস্থা দেখা দেয়, বিরোধী অবস্থার সামনে না পড়ায় গোসাঁইজী তা জানতেন না। অর্থাৎ পুরী-মহারাজ সে জন্য পরমেশশক্তি, অনাদ্যবিদ্যা, ও মায়ার দুরন্ত প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের গুরুভাবের সংস্পর্শে এসে তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব দূর হয় এবং পরিশেষে মায়ার শক্তি মেনে নিয়ে ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ জেনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর কাছ থেকে তিনি বিদায় নেন।

তোতাপুরীজী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তিনি 'কিমিয়া' বিদ্যা জানতেন, অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন হলে ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তিনি তাম্রাদি ধাতু স্বর্ণে পরিণত করতে পারতেন এবং কয়েকবার করেছেনও। কিন্তু ঐ বিদ্যার সহায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস একেবারে নিষিদ্ধ।

১৭. শিব ও শক্তি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ (অবিনাভাব-সামরস্য) উপলব্ধি করতে গেলে দীক্ষা ও অভিষেক প্রয়োজন। অভিষেক নানা স্তরের হতে পারে। শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক, মহাসাম্রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি। দীক্ষা আবার নানাবিধ। বৈদিকী, তান্ত্রিকী, বৈষ্ণবী ও বৌদ্ধ। অধ্যাত্ম রাজ্যে দীক্ষা একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। কারণ দীক্ষা ছাড়া কোন সাধনাই সিদ্দি লাভ করে না।

(১) পরশুরাম কল্পসূত্রের পরিশিষ্টে 'নিত্যোৎসব' গ্রন্থে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা আছে। তান্ত্রিক দীক্ষা তিন প্রকার—শাম্ভবী, শক্তি ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষা দান করতে পারেন সিদ্ধ-সাধক জ্ঞানী গুরু। সাধারণ শিষ্য শাম্ভবী দীক্ষা লাভের অধিকারী নয়।

(২) শাম্ভবী দীক্ষার পর 'নিত্যোৎসব' গ্রন্থে শক্তিদীক্ষার বর্ণনা আছে। শক্তি দীক্ষায় জ্ঞানবান গুরু শিষ্যের মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দীপ্ত ও প্রজ্বলিত পরাসংবিদরূপা প্রকাশ-লহরী চিন্তা করে কিরণজালের দ্বারা শিষ্যের পাপরূপ অজ্ঞানপাশ দগ্ধ করেন। এর নামই শক্তি প্রবেশ রূপ শাক্ত দীক্ষা।

(৩) মান্ত্রীদীক্ষা আচারিক অনুষ্ঠান। ঘটস্থাপন, মণ্ডলনির্মাণ, মন্ত্ররচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সহ যথাবিধি পূজা হোমানুষ্ঠান, ও শিষ্যের কানে বীজমন্ত্র দান প্রভৃতি মান্ত্রীদীক্ষার অঙ্গ। এ সকল ছাড়াও বাগ্‌দীক্ষার কথা বলা আছে। বাগ্‌দীক্ষায় বীজমন্ত্র প্রধান।

"তন্ত্র শাস্ত্রের মতে নাদ সূক্ষ্মতম অব্যক্ত শব্দ, এটা ক্রিয়াশক্তির প্রথম অবস্থা। পরানাদ ও পরাবাকের-সমষ্টি পরাশক্তি। পরাশক্তি মূলাধার-বাসিনী, চিতিরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি। মূলাধার শক্তি ও সহস্রার শক্তি স্বরূপত এক ও সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য একটিতে মহাশক্তি থাকে সুপ্ত অপরটিতে মহাশক্তি থাকে চিদঘনরূপে জাগ্রত। সারদা তিলক তন্ত্রের টীকাকার পণ্ডিত রাঘব ভট্টের মতে শব্দব্রহ্মই সর্বজীবাশ্রয়ী চৈতন্য ও প্রকৃতি। একেই বলা হয় ব্যাপকশক্তি কুণ্ডলিনী বা কুণ্ডলীরূপা কামকলা। মন্ত্র-তন্ত্রের ক্ষেত্রে নাদ প্রথম অবস্থায় বিকাশোন্মুখী শক্তিরূপে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু বা শব্দব্রহ্মরূপে বা বিন্দু নাদ ও বীজরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ত্রিবিন্দু হল কাম-কলা-কুণ্ডলিনী শক্তি। বাক্যরূপ নাদ

বীজ মন্ত্রের সাহায্যে সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। আদিনাদ ওঁকার মহাবীজ চৈতন্যে শব্দব্রহ্ম প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।" (দ্রঃ ৯ কুণ্ডলিনী শক্তি)।

১৮. কামারপুকুর থেকে গদাধর চট্টোপাধ্যায় যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন তিনি 'পরমহংস', 'পরমহংস মশাই' বা 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস'—প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। বৈদান্তিক সাধকদের চরম অবস্থাকে 'পরমহংস' বলে, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে 'সচ্চিদানন্দ'-কে সার উপলব্ধি করাই পরমহংসের লক্ষণ। কেশবচন্দ্র সেনের উক্তিতে, ইংদেশের গৌরী পণ্ডিতের সম্বোধনে ঐ সকল নাম পাওয়া যায়। তা-ছাড়াও রামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রথম দিকের পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতেও যেমন, 'The Indian Mirror'—20. 2. 1886, 'তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকা', 'শ্রীম'-র ডায়েরী', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত' (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯০, ৮ই জুলাই), স্বামী অভেদানন্দর 'আমার জীবনকথা'…ইত্যাদি 'পরমহংস' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব, প্রথম দিকে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের পরমহংস-নাম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে তোতাপুরীজির দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে কেউ কেউ 'পরমহংস' নাম ব্যবহার করলেও, ঐ নামের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় তোতাপুরীজির ঐ নাম ব্যবহারের পর থেকে।

এখন প্রশ্ন, রামকৃষ্ণ নাম কে দিল এবং কবে থেকে ঐ নামের ব্যবহার চলছে? পরমহংস-দেবের জীবিতকালেই কোন কোন পত্র-পত্রিকায় এবং তাঁর দেহান্তের পর ম্যাক্সমুলার, ডিগবী, টনী প্রভৃতি নানা বিদেশী পণ্ডিতদের লেখায় রামকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণদেব নামের ব্যবহার দেখা যায়।

ভগিনী দেবমাতার (রামকৃষ্ণের একজন জীবনীকার) মতে গদাধরকে রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন তোতাপুরীজি। লেখিকার তথ্যের উৎস রামকৃষ্ণানন্দ।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত) বলেন, অগ্রজদের নামের প্রথমে 'রাম' শব্দটি থাকায় সম্ভবত পরম ভক্ত মথুরামোহন রামকৃষ্ণ নাম রাখেন। আবার প্রিয়নাথ সিংহ ওরফে গুরুদাস বর্মন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' গ্রন্থের ভূমিকায় একটি মূল্যবান সংবাদ দিয়েছেন। ঠাকুরের তিরিশ বছরের সেবক ও সঙ্গী হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা, যা বরানগরের মঠবাসিগণ একটা খাতায় লিখে রেখেছিলেন সেখানে বলা আছে, "বালকের নাম রাখা হইল রামকৃষ্ণ। কিন্তু ক্ষুদিরাম পূর্বদৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া পুত্রকে গদাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন।"

শশিভূষণ নামে ঠাকুরের প্রথম দিকের একজন পরম ভক্তের মতে, "বিশেষ কারণবশতঃ পিতা তাঁহার গদাধর নাম রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার বংশানুক্রমিক নাম তাহা বংশাবলী দেখিলেই বুঝা যায়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব)।

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'রামকৃষ্ণ'-নামের প্রধান উৎস চারিটি—১) রামকৃষ্ণ নাম পিতৃদত্ত, ২) গদাধরের সন্ন্যাসকালে তোতোপুরী গোস্বামী ঐ নাম দিয়েছিলেন, ৩) গদাধরের প্রথম ও প্রধান রসদ্দার ভক্ত মথুরমোহন গদাধরের মধ্যে ঐশ্বরীয় শক্তি দেখে ঐ নামকরণ করেন। স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দ গিরির 'শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী' গ্রন্থে রামকৃষ্ণ নামের চতুর্থ উৎসের কথা বলা হয়েছে। ঠাকুরের কুল দেবতার নাম 'শ্রীরাম', সুতরাং 'রাম' শব্দটির নির্বাচন সহজেই অনুমেয়। 'শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে কৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব লক্ষণ দেখিয়া চতুরাক্ষরী রামকৃষ্ণ নাম যে নির্বাচিত হইতে পারে, তাহা সুখবোধ্য'।

পূর্বোক্ত উৎস সকলের মধ্যে 'রামকৃষ্ণ' নাম যে তাঁর পিতৃদত্ত এই উৎসটাই সব দিক থেকে

যুক্তিসহ বলে মনে হয়। কারণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (সাধক ভাব পরিশিষ্ট, বর্তমান সংস্করণ), গ্রন্থে দেখা যায় ব্রাহ্মণী ভৈরবীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্র সাধন আরম্ভ হয়েছিল বাংলা ১২৬৭ বা ইং ১৮৬১ খ্রীঃ। আবার তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণ বাংলা ১২৭১, বা ইং ১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ। রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিল রেজেষ্ট্রি হয় বাংলা ১২৬৭—৮ই ফাল্গুন বা ইং ১৮৬১-১৮ই ফেব্রুয়ারী! ঐ দলিলের মধ্যে পাওয়া যায় বাংলা ১২৬৫ বা ইংরেজী ১৮৫৮-খ্রীঃ-র একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ঐ সময় গদাধর রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে পূজক ছিলেন। দলিলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের নামে বরাদ্দ হয়েছে নগদ ৫৲, এবং বাৎসরিক ৩ জোড়া কাপড়, ও ৪।।. টাকার ব্যবস্থা। ঐ দলিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ব্রাহ্মণী ভৈরবী ও তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রামকৃষ্ণ' নাম ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, 'রামকৃষ্ণ'-নামের উৎস ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী কেউই নন।

মথুরবাবু সম্পর্কে বলা যায়, ঠাকুরের সরল বালক ভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দররূপ প্রথম দর্শনেই মথুরমোহন মুগ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভাব-ভক্তি দৃঢ় হয় যখন তিনি বুঝতে পারেন, 'ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন'। মথুরমোহনের এই ধারণার পশ্চাতে আছে ঠাকুরকে 'শিব-কালী'-রূপে দর্শন। এই ঘটনাটি ঘটে ১৮৬০-৬১ খ্রীঃ। কিন্তু পূর্বোক্ত ১৮৫৮ খ্রীঃ-র দলিলের মধ্যে রামকৃষ্ণ নামের উল্লেখ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে মথুর-মোহন ঠাকুরকে রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন সে কথা ঠিক নয়। অতএব, অদ্বৈতাশ্রম প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna'—গ্রন্থের উক্তিটি সম্ভবত যথার্থ নয়। উক্তিটি হল,—"Most probably it was given by Mathur Babu, as Ramlal, the nephew of Rama Krishna says on the authority of his illustrious uncle himself."

শ্রীঠাকুর নিজমুখে বলেছিলেন, 'আমার বাবা 'রাম' উপাসক ছিলেন, আমিও 'রামাৎ'-মন্ত্র গ্রহণ করিযাছিলাম'—শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এই বংশের অধিকাংশ পুরুষের নাম 'রাম'-নামের সঙ্গে যুক্ত। অতএব, সাধারনভাবে এটা ভাবা অযৌক্তিক হবে না যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদত্ত আসল নাম 'রামকৃষ্ণ', গদাধর বা গদাই ছিল তাঁর ডাক নাম।

পূর্বোক্ত বক্তব্যটিকে আরও যুক্তিসহ করবার জন্য বলা যায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের প্রথম প্রতিলিপিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

তাছাড়াও রামকৃষ্ণ নামের একটা বড় প্রমাণ হল ঠাকুরের নিজের উক্তি। উক্তিটি 'শ্রীম'-র ডায়েরীতে লেখা ছিল। ১৮৮৬ খ্রীঃ-র ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ঠাকুর তাঁর গলার অসহ্য যন্ত্রণা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—'এই মুখে কত লবঙ্গ, এলাচ ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি, বাবার আদরের ছেলে ছিলুম 'রামকৃষ্ণ বাবু' তারপর কত ঈশ্বরীয় নাম হল, তারপর এই পুঁজ, রক্ত, আর যন্ত্রণা। ('শ্রীম'র ডায়েরী)। ঘরে সে সময় উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্রলাল মজুমদার ও রামকৃষ্ণ-সেবক লাটু। অতএব, রামকৃষ্ণ নাম পিতৃদত্ত।

পূর্বোক্ত তথ্যের দিক ছাড়াও রামকৃষ্ণ নাম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যটি সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী। এই গ্রন্থে আমরা সেই ধারার অনুসরণ করেছি। স্বামীজী বলেছেন,—"সোঽয়ং জাতঃ প্রথিত পুরুষো রামকৃষ্ণস্তিদানীম্‌"—যে বিগ্রহে প্রকটিত হয়েছিল এই মহান শক্তি, তাঁকে কে বা কারা প্রথম রামকৃষ্ণ নাম ব্যবহার করেছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ঐ নরবিগ্রহকে কেন্দ্র করে যে মহান ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে, যাকে বলা হয়েছে 'রামকৃষ্ণ ফেনোমেনন'—তাঁর গুরুত্ব ক্রমেই ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, তাঁর প্রভাব

চতুর্দিকেই বিভিন্ন ও বিচিত্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই প্রচার প্রসার ঘটেছে 'রামকৃষ্ণ'-নাম অবলম্বন করে।

১৯. নানা প্রকার প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের সাধনায় এগিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সকল ধর্মমতের প্রতিটির যথার্থ ফল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধর্মবিরোধ ও তাৎকালিক ধর্মগ্লানি নিরসনের জন্যই তিনি প্রতিটি ধর্মমতের সাধন করেন। প্রতিটি ধর্মমতে সিদ্ধ হয়ে ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধি সকলের মধ্যে 'যত মত, তত পথ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'ভাবমুখে থাক'—অধ্যাত্ম স্তরের এই চরম উপলব্ধি লাভের পূর্বে ঠাকুরের নিজের ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না। 'মা আমার, আমি মার'—এই কথা সর্বক্ষণ চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা করতে করতে বাস্তবিক ঠাকুর জগদম্বার বালক হয়ে গিয়েছিলেন। মার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছাই তাঁর মনে সায় দিত না। আর যে ইচ্ছা হত তা হল মাকে নানা পথে, নানা ভাবে দেখবার বা জানবার। ফলকথা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, 'মার কাজ মা করেন, আমি জগতের কাজ করবার, লোক শিক্ষা দেবার কে?' এই ভাবটি ঠাকুরের মনে লোকগুরু পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকাপাকি বদ্ধমূল ছিল। লোকগুরু পদে উন্নীত হয়েও ঠাকুরকে মাঝে মাঝে মাকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যেত,—'কচ্ছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? আমার নাইবার, খাইবার সময় নাই'। (ঠাকুরের গলায় তখন ব্যাথা আরম্ভ হয়েছে), নিজের শরীর লক্ষ্য করে বলতেন, 'একটা তো ভাঙ্গা ঢাক, এত করে বাজালে কোন দিন ফুটো হয়ে যাবে যে, তখন কি করবি'?

মা জগদম্বা স্বয়ং 'যত মত, তত পথ'-রূপ উদার ভাব ঠাকুরের মধ্যে এনেছিলেন। এ কথা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে আর একটা প্রশ্ন জাগল, কারা এই ভাব গ্রহণ করে ভারতকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে, কাদের এই ভাবের জন্য মা চিহ্নিত করে রেখেছেন। ঐ কথা ভাবতে ভাবতে ঠাকুর ধৈর্য হারালেন, অস্থির হয়ে উঠলেন। ঐ সময় তিনি ছাদে উঠে চীৎকার করে ডাকতেন, 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে'। তার কিছু দিন পরে একে একে সব আসতে আরম্ভ করল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হলেন।

কারা উত্তরকালে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা হবে, সে প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলতেন, "যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে; যে ঈশ্বরকে একবার ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।" ঠাকুরের এই সকল সরল, সহজ কথার উপর সাধারণ মনে সন্দেহের ভাব দেখা দিতে পারে। তার উত্তরে আমরা পূর্বেই বলেছি লৌকিক অর্থে ঠাকুরের সব কথার অর্থ সব সময় ধরা যায় না, কারণ যার গোটা জীবন সাধারণের থেকে বিপরীত, অধ্যাত্ম সাধন ক্ষেত্রে যিনি এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, তাৎকালিক মানসিকতার প্রতি স্তরেই যিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে গেলে মনের অতলে ডুবতে হবে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যেটা পূর্বে ঘটেছে তা সাধারণ লোক দেখতে পায়, ঘটবার পক্ষে তার কারণ অনেকে অনেকখানি বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু যেটা ঘটবে তা কজন দেখতে পায়? ন্যায়দর্শনে অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যোগজ প্রত্যক্ষের কথা বলা আছে, ঠাকুর সাধনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা যোগজ প্রত্যক্ষ লাভ করেছিলেন, ফলে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অনাগত সম্পর্কে যা কিছু বলে গেছেন পরবর্তী কালে সে সবই বাস্তব আকারে দেখা দিয়েছে।

এখানে 'যত মত, তত পথ' বা 'সর্ব ধর্ম সত্য'—এই বাক্যটির বিস্তারে কিছু বলা হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিব্য ও ব্যবহারিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের তাৎকালিক ধর্মহীনতা বা ধর্মক্ষেত্রে অরাজকতা, প্রচলিত ধর্মমত-সকলের একদেশদর্শিতা প্রভৃতি দেখেছিলেন। প্রতিটি ধর্মমত সমভাবে সত্য হলেও এবং নানা প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চরমে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেও পূর্বাচার্যগণের তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে অপপ্রচার ইত্যাদি ঐ সময় ধর্মক্ষেত্রে এক অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের পর ঠাকুর 'যত মত, তত পথ'—এই মহাসত্য অনুভব করেছিলেন। আর অনুভব করেন যে, একদেশদর্শিতার গন্ধমাত্র রহিত বিদ্বেষসম্পর্কমাত্রশূন্য তাঁর ঐ নিজ ভাব জগতের পক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার।

'সর্ব ধর্মমতই সত্য' বা 'যত মত, তত পথ'—ধর্মক্ষেত্রে এই পরম উদার কথা জগৎবাসী সম্ভবত ঠাকুরের মুখ থেকে প্রথম শুনল। পূর্বে ধর্মাচার্যগণের কারও কারও মধ্যে ঐ ভাবের আংশিক প্রকাশ দেখা দিয়েছে ঠিক, কিন্তু সে ভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন সর্বজনীন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি। কারণ, ঐ সকল আচার্য নিজ নিজ বুদ্ধি সহায়ে প্রত্যেক মতের কিছু কিছু অংশের মধ্যে যতটুকু সার অংশ বলে বুঝতেন সে সকলের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ভাব টানাটানি করে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করে গেছেন। ঠাকুর প্রধান প্রধান প্রতিটি ধর্মমতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করে সমান অনুরাগে প্রতিটি ধর্মমত নিজ জীবনে সাধন করে সেই মতনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে ঐ মতের মূল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূর্বে কোন আচার্যই ঐ ভাবে প্রতিটি ধর্মমতকে সম্ভবত গ্রহণ করেন নি। ঐ উদার ভাবের পরিচয় অতি বাল্যকাল থেকেই ঠাকুরের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী কালে ঠাকুর তা আচরণগত দিক থেকে যাচাই করে গ্রহণ করেছিলেন। তীর্থ ভ্রমণের পর ঐ ভাব ঠাকুরের মধ্যে দৃঢ়মূল হল—এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পূর্ব-পূর্ব আচার্যগণ এক একটি বিশেষ ধর্মমতের পথ দিয়ে কেমন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ দিয়ে গেলেও ঐ ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে যে একই লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছান যায়, এ-সংবাদ তাঁদের মধ্যে কেউই আজ পর্যন্ত প্রচার করেন নি। ফলে সম্প্রদায়গত দিক থেকে তৎকালে ধর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করায় ধর্মরাজ্যে একটা নৈরাজ্যের ভাব দেখা দিয়েছিল। নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি ধর্মের মূল তাৎপর্যকে ম্লান করে তুলেছিল। ঠাকুরই প্রথম এ-সত্য উপলব্ধি করলেন এবং ধর্মজিজ্ঞাসুদের কাছে এ কথা বললেন; ফলে ধর্ম-পথ-যাত্রীরা ধর্মক্ষেত্রে এক নতুন আলোর নির্দেশ পেল। প্রতিটি ধর্মমতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের পক্ষে একটা মানসিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হল।

প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, 'যত মত, তত পথ' বা 'প্রতিটি ধর্মমত সত্য'—এই বাক্যটি কোন সমন্বয়বাদ নয়, নানা ধর্মের সার বস্তুর সমাহার নয়। ধর্মের পথ ও মত সম্পর্কে সামান্যত উক্ত কোন একটি বচন নয়। এই বাক্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এর মূলে আছে গ্রহণসাপেক্ষ সাধন। তাই ঠাকুর প্রতিটি ধর্মমত ও পথ নির্বিবাদে গ্রহণ করেছিলেন ও আচরণগত সাধন করেন এবং ঐ ধর্মের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। এইভাবে ঠাকুর সর্বধর্ম সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ধর্মের মূলে প্রবেশ করে প্রতিটি ধর্ম-মতানুসারী পথের সন্ধান করেন এবং পরিণাম উপলব্ধি করেন—প্রতিটি ধর্মমত ও তার পথ সমান সত্য। অতএব, 'যত মত, তত পথ'—এটি নানা ধর্মের সার কথার সমন্বয় নয়; প্রতিটি মত ও তদনুসারী পথ যে সত্য তার ঘোষণা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্ম ভারতের প্রাণশক্তি, আধ্যাত্মিক চেতনার নির্দেশক, সামাজিক সাম্য ও সংহতির প্রতীক। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে ঐ

সর্বজনীন ধর্মচেতনা বিকৃত হয়ে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে বদ্ধ ছিল। স্বভাব বা স্বধর্মের পথ ত্যাগ করে জন্মভিত্তিক জাতিধর্মের উপর অহেতুক জোর দেওয়ার ফলে মানুষে মানুষে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মবাদী সকল একে অপরকে হেয় করবার জন্য, নিজ নিজ মতের প্রাধান্য প্রচারে তৎপর হন। কখনও কখনও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা কেউ কেউ প্রচার করেছেন ঠিক, কিন্তু মানুষের মনে তার কোন আবেদন হয় নি, কোন জিজ্ঞাসা জাগে নি; কারণ, আচরণ-নিরপেক্ষ কোন মতেরই স্থায়ী মূল্য হয় না, সাময়িকভাবে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও তা সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিটি ধর্মমত নিজে গ্রহণ করে এবং ঐ মত-নির্দিষ্ট পথে নিজে আচরণ করে 'যত মত, তত পথ' আবিষ্কার করলেন, ধর্মজগতে রেষারেষির অবসান ঘটল, দীর্ঘদিনের সম্প্রদায়গত ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙ্গে গেল। ধর্মকে মানবচেতনার মুক্তাঙ্গনে ঠাকুর নিয়ে এলেন, ধর্মাচরণে মানুষ প্রাণের স্পর্শ পেল, ধর্মপথযাত্রী নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ হল।

২০. বিশ্বকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ভাব মুখে থাক' ঠাকুরের অধ্যাত্ম সাধনার চরম অনুভব। নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ অনুভব হয়েছিল। এখানে ঐ বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা হবে।

দীর্ঘ ছয় মাস কাল নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকার ফলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল। তাঁর অস্মিত্ব একেবারে চলে গিয়েছিল। ঠাকুরের দেহ বুদ্ধির লোপের আভাস বাল্যকালে তাঁর ভাব-সমাধির মধ্যে দেখা যায়। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, ঐ সময় একজন সাধু দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন এবং ছয় মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে শ্রীঠাকুরকে ব্যবহার-ভূমিতে নামিয়ে আনতে সাহায্য করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছা-শক্তিতেই ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। শোনা যায় নির্বিকল্প সমাধিতে মনস্থির হওয়ার পর ২১-দিনের বেশী দেহ রাখা সাধকদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

যে বিরাট চৈতন্য শক্তি জগদম্বারূপে নাম-রূপময় এই জগৎ হয়েছেন এবং জড় ও চেতন সব কিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি ঐ সময় ঠাকুরকে আদেশ দিলেন, 'ভাব মুখে থাক'।

ঐ সময় ঠাকুরের মানসিক অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ কখনও তাঁর মধ্যে আমি-র উদয় হত, আবার সঙ্গে, সঙ্গে সে ভাব লোপ পেত। একটা বিরাট মনে নানা ভাব-তরঙ্গ উঠছে ডুবছে একমাত্র সেটাই দেখা যেত।

এখানে প্রশ্ন, 'ভাব মুখে থাক'-বলতে আমরা কি বুঝি? নিগুর্ণ ও সগুণের মধ্যস্থলে যে 'বিরাট আমিত্ব'টা বর্তমান, উহাই 'ভাবমুখ' কারণ উহা থাকাতে বিরাট মনে অনন্ত ভাবের প্রকাশ হচ্ছে। ঐ বিরাট আমিই জগজ্জননী বা ঈশ্বরের 'আমিত্ব'। ঐ বিরাট 'আমিত্বের' স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেছেন 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'-স্বরূপ জ্যোতির্ঘন মূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখানে উল্লেখ্য, ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখ-দুঃখাদির ভাব হয় ভাব মুখে থাকার অর্থ তা নয়, লোকগুরুদের ভিতর বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ সহজেই উপস্থিত হয়। ঠাকুরের আমিত্ব জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হচ্ছিল তখন তিনি বিরাট আমিত্বের গণ্ডীর পারে অবস্থিত জগদম্বার নিগুর্ণ ভাবে অবস্থান করছিলেন, তখন ঐ বিরাট আমি ও তাঁর অনন্ত ভাবতরঙ্গ, যাকে আমরা জগৎ বলি, তার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভূত হত না; আর যখন ঠাকুরের 'আমি'-জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছিল তিনি তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার সঙ্গে যুক্ত সগুণ 'বিরাট আমি' ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গ সকল দেখছিলেন। ঐ নিগুর্ণভাবে আরূঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম-'র ভিতর স্বগত ভেদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছিল; আর ঐ

সগুন বিরাট আমিত্বের যখন বোধ হচ্ছিল, তখন তিনি দেখছিলেন,—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, যে নির্গুণ, সেই সগুণ, যে পুরুষ, সেই প্রকৃতি…ইত্যাদি। (বাহ্য জগতের রূপ-রসাদি বিষয়-সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখ-দুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক প্রযত্ন বা ইচ্ছা, বা 'এটা করব', ওটা বুঝব', এটা ভোগ করব, 'ওটা ত্যাগ করব'—ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তি যখন লোপ পায় বা মন যখন সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হয় তখনই মন সমাধি ভূমিতে অবস্থান করে।) 'আমি'-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তি সকলের উদয় হয়, উহার আংশিক লোপ সবিকল্প অবস্থা ও পূর্ণ লোপে নির্বিকল্প সমাধি হয়। ঠাকুর আরও উপলব্ধি করলেন, যিনি স্বরূপত নির্গুণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ। জগদম্বার নির্গুণ-সগুণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাওয়ার পর, ঠাকুরকে মা আদেশ দিলেন, 'ভাব মুখে থাক' অর্থাৎ আমিত্বের পূর্ণ লোপ করে একেবারে নির্গুণ ভাবে থেকো না। কিন্তু যা থেকে যত রকম ভাবের উৎপত্তি হচ্ছে সেই বিরাট 'আমি'ই তুমি, তাঁর ইচ্ছাই তোমার, তাঁর কাজই তোমার কাজ—এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বক্ষণ অনুভব করে জীবন যাপন কর ও লোক কল্যাণে নিজেকে নিয়োগ কর।

অতএব, 'ভাব মুখে' থাকার অর্থই হচ্ছে মনে সর্বতোভাবে, সকল সময় আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'—এই বাক্যটি অনুধ্যান করা। 'ভাবমুখে' অবস্থায় পৌছিলে সাধকের পুর্বাশ্রম সব চলে যায়, অর্থাৎ সাধকের অতীত বলে তখন আর কিছু স্মরণে থাকে না। 'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি'—এই কথাটাই সর্বদা অনুভবে আসে। ঠাকুর তাই সব সময় বলতেন, 'ওরে অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর'।

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা অনুসরণ করে কি বলা যায়, ঠাকুর প্রকৃত অদ্বৈতবাদী ছিলেন না? শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগত ভেদ স্বীকার করেও ঠাকুর যখন জগন্মাতার নির্গুণ-সগুণ দুভাবে অবস্থান দেখতেন, তখন তো স্বীকার করতে হবে, তিনি আচার্য শংকর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ মানতেন না, কারণ শংকরের অদ্বৈত মতে পারমার্থিক দিক থেকে জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভব বিচার করলে দেখা যাবে ঠিক তা নয়। কারণ, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল মত বা ভাব ঠাকুর মানতেন। মানুষের অধ্যাত্ম উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তরে ঐ সকল ভাবের উদয় হয়। এক বিশেষ অবস্থায় দ্বৈত ভাবের উদয় হয়, তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলে বোধ হয়। আবার বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব এলে অনুভব হয় নিত্য, নির্গুণ সত্যই বস্তু-লীলায় সর্বদা সগুণ হয়ে রয়েছেন। তখন দ্বৈত-বোধ ত মিথ্যা বলে মনে হয়ই, আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাও উপলব্ধি হয় না। আবার সাধক যখন অদ্বৈত স্তরে অবস্থান করেন, তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ রূপেরই কেবলমাত্র উপলব্ধি হয়। তখন 'তুমি-আমি', 'জীব-জগৎ', 'ভক্তি-মুক্তি', 'পাপ-পুণ্য', 'ধর্মাধর্ম' সব একাকার হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত ঠাকুর এখানে হনুমানের দাস্যভাবের উল্লেখ করে বলেছেন,—শ্রীরামচন্দ্র কোন এক সময়ে ভক্ত হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তুমি আমাকে কি-ভাবে দেখ, ভাবনা বা পূজা কর?" হনুমান তার উত্তরে বললেন, 'হে রাম! যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি, অর্থাৎ আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি,—তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি সেব্য আমি সেবক; তুমি পূজ্য, আমি পূজক। যখন মন, বুদ্ধি ও আত্মা-বিশিষ্ট জীবাত্মা বলে আপনাকে বোধ করতে থাকি, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্ররহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি তুমিও যাহা, আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।"

ভারতের অধ্যাত্ম চেতনার পতন-অভ্যুত্থানের ইতিহাসে 'ভাব মুখে থাক'—ঠাকুরের এই অধ্যাত্ম অনুভব সম্ভবত অতি প্রাচীন ও মৌলিক পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিন জাতীয় অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক একদর্শী বিকৃত ভাব দেখা দিয়েছিল। ফলে ভারতের প্রাচীন অভ্যুদয়ের কথা আমরা ভুলে গিয়ে একমাত্র জীবন-নিরপেক্ষ নিঃশ্রেয়সকে সারবস্তু বলে মেনে নিয়েছিলাম। তাও খুব দৃঢ়ভাবে নয়, বিকৃতভাবে। ফলে জগৎ সংসার কিছু নয় মায়া, অলীক এবং যে সমাজ ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের মেরুদণ্ড, সে সমাজেরও কোন মূল্য নেই—প্রভৃতি কথা যেন ভারতীয়তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ভারতের ইতিহাসে পাশাপাশি চলেছে। ফলে আমরা কমজোরী, প্রাণহীন হয়ে পড়েছিলাম। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মুক্তিই যেন সব কথার শেষ কথা এ ধারণাই আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে এলেন অধ্যাত্ম উপলব্ধির চরম স্তরে আরূঢ় হয়ে লোককল্যাণের কথা মা-জগদম্বার কাছ থেকে শুনলেন ও অপরকে শোনালেন, যোগ্য সাধকদের হাতে সে অমূল্য সাধন সম্পদ তিনি তুলে দিলেন, ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বচেতনায় এক নতুন সাড়া জাগল। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, বুদ্ধের আধ্যাত্মিক জীবনে ঐ একই ধারার সন্ধান মেলে। 'পরিনিব্বান'-লাভ করেও বুদ্ধ আবার এই জগতে ফিরে এসে বোধিসত্ত্বের কথা বললেন, সমাজ-কল্যাণের কথা বললেন, নির্যাতিত মনুষ্যত্বকে সেবা করতে বললেন। ব্যক্তি-মুক্তির কথা কয়েকজন নির্দিষ্ট লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের পক্ষে প্রযোজ্য, যাঁরা বলতে পারেন সমাজ, নৈতিক মূল্য-বোধ, জগৎ সংসার—সবই 'এহ বাহ্য.' নিরালম্বী সন্ন্যাসী সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, ঐ সকল যতিগণ, সৎ অসৎ, ভাল, মন্দ, ধর্ম, অধম সব কিছুর ঊর্ধ্বে হলেও কোন অবস্থায়ই তাঁরা অধর্মাচরণ করেন না। অতএব, 'ভাব-মুখে থাক'—অধ্যাত্ম মুক্তির চরম কথা হলেও সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-তথা-বিশ্বকল্যাণের কথা।

২১. ইং ১৮৫৮ সালে কলকাতার পূর্বভাগে নারকেলডাঙ্গায় রামচন্দ্র দত্তর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত, মাতার নাম তুলসীমণি দেবী। অল্প বয়সেই রামচন্দ্র দত্তর মাতৃবিয়োগ হয়।

নৃসিংহপ্রসাদ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। দৈব-দুর্বিপাকে সে-সবই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি বিশ্বনাথ দত্তের (নরেন্দ্রনাথের পিতা) বাড়ীতে সিমলায় এসে বসবাস করেন। পারিবারিক সম্পর্কে নৃসিংহপ্রসাদ বিশ্বনাথ দত্তর সহধর্মিনী ভুবনেশ্বরী দেবীর দাদামশাই ছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত ও তস্য পত্নী রামচন্দ্রকে নিজের ছেলের ন্যায় লালন-পালন করেন। নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রামচন্দ্রকে বড় ভাইয়ের মত দেখতেন। রামচন্দ্র দত্ত ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমান স্থার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) থেকে ডাক্তারী পাশ করে বাংলা সরকারের রাসায়নিক পরীক্ষকের প্রধান সহকারী হয়েছিলেন।

২২. There is only one way to remove caste-distinction and that is by love of God. Lovers of God have no caste.

২৩. বৈদান্তিক সাধক শ্রীমৎ তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত-সাধনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "চল্লিশ বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন"। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চদশ অধ্যায়।

২৪. বিবেকানন্দ একদিন তাঁর বন্ধু হরমোহন মিত্রকে বলেছিলেন, "ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যাইতে পারে"। যেমন 'ভাবমুখে-থাক'; 'যত মত তত পথ'; 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'; 'বকলমা দেওয়া' ইত্যাদি।

২৫. কর্মযোগ (কর্মযোগের আদর্শ, কর্মরহস্য, মুক্তি) ; রাজযোগ (প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ, প্রত্যাহার ও ধারণা, ধ্যান, সমাধি)। জ্ঞানযোগ (মানুষের যথার্থ স্বরূপ, মায়া ও মুক্তি, ব্রহ্ম ও জগৎ, কর্মজীবনে বেদান্ত); বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

২৬. We shall create a people who will be Indians only by birth but they will be Europeans in their thoughts, words and deeds.

২৭. ব্রাহ্ম ধর্মের আন্দোলন, প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠা, আর্যসমাজ আন্দোলন, থিয়োসফিকাল সোসাইটি প্রভৃতির সংগঠন।

২৮. The Brahmo Samāja and the Prārthanā Samāja were largely products of ideas associated with the West, and represented the Indian response to Western rationalism.

২৯. স্বামী বিবেকানন্দর 'বাণী ও রচনা'।

৩০. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।

৩১. বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাঙ্গালীর সমাজ চিত্র।

৩২. His religious activity and experience were in fact comprehensive to a degree that had perhaps never before been attained by any other religious genius, in India or elsewhere.

৩৩. রাগ, দ্বেষ বা কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করাই নিষ্কাম কর্ম। শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে এই নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন—**নিষ্কাম** কর্মে জীবের অহং বুদ্ধি থাকে কি, থাকে না? উত্তরে বলা যায়, 'অহং'-বোধ থাকে, কিন্তু সে অহং-বোধ সম্পূর্ণ স্বার্থমুক্ত।

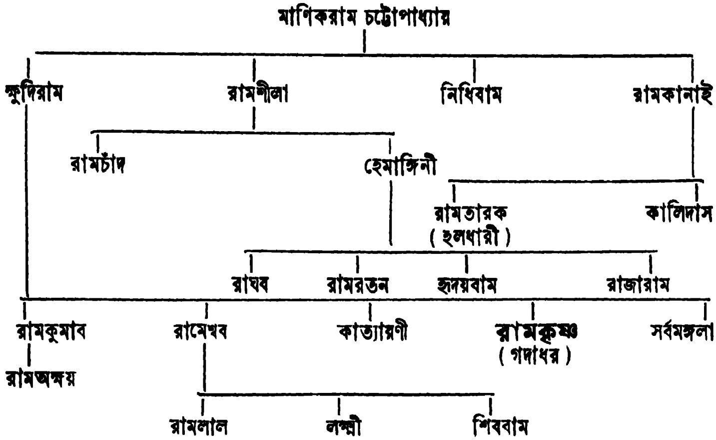
নিরভিমান কর্মে অহং-বোধও থাকে না। যন্ত্রী যেমন যন্ত্রকে চালায়, জীবও তখন সেইভাবে চলে। বৈষ্ণব ভাবোক্ত তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র নিরভিমান কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভূত সংগ্রহার্থক কর্ম লোকগুরুরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য করেন। এখানে রাগ, দ্বেষ নেই, কিন্তু আমিত্ব-বোধ আছে। অবশ্য সে আমি স্বার্থ-বাধিত নয়।

ঈশ্বরার্পিত কর্ম, নিষ্কাম কর্মী যখন তাঁর কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, সে সকল ঈশ্বরার্পিত কর্ম।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত চার প্রকার কর্মের কথা বলা আছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য পূর্বোক্ত কর্মসকলে রাগ, দ্বেষের কোন অবকাশ নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বংশতালিকা



প্রায় সব নামেরই আগে বা পরে রাম নামের উল্লেখ আছে। কারণ সম্ভবত কুলদেবতা ৺রঘুবীরের জন্য।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা বই

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত— শ্রীম কথিত (১-৫ ভাগ), কথামৃত ভবন

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সারদানন্দ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), উদ্বোধন কার্যালয়।

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রকাশক শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

৫। ভারতীয় সাধনার ধারা—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

৬। তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

৭। কৌলমার্গ রহস্য—সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা।

৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

৯। সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র—বিনয় ঘোষ।

১০। মহানির্বাণ তন্ত্র—সম্পাদিত, আদিব্রাহ্মসমাজ—কলিকাতা ১৮৭৬, ইংরেজী অনুবাদ—এম. এন. দত্ত, কলিকাতা ১৯০০।
ইংরেজী অনুবাদ—আ. অ্যাভালন, লণ্ডন, ১৯১৩।

১১। ষট্‌চক্র নিরূপণ (শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণির অংশ)—টি. বিদ্যারত্ন (অ্যাভালন তান্ত্রিক টেক্‌সটস, কলিকাতা ১৯১৩)।

১২। দি সারপেণ্ট পাওয়ার, আর্থার অ্যাভালন কতৃক ইংরেজীতে অনূদিত, মাদ্রাজ, ১৯২৪।

১৩। রহস্য পুজা পদ্ধতি—জ্ঞানেন্দ্র তন্ত্ররত্ন, কলিকাতা, ১৩৭৪।

১৪। স্বামী বিবেকানন্দর বাণী ও রচনা—(১-১০ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়

১৫। উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ—বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা।

১৬। বাণী ও বিচার—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—(১-২ ভাগ), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ।

ইংরেজী বই

১৭। Sri Ramakrishna in the Eyes of Brahmo and Christian Admirers—Ed. by Nanda Mukherjee, Firma K.L.M. (P) Ltd.

১৮। Ramakrishna—Indian Thought and Its Development—Albert Schweitzer, Bombay.

১৯। Ramakrishna Paramhansa — Man I have seen, Sivanath Shastri, Calcutta.

২০। The Life of Ramakrishna—Romain Rolland.

২১। Ramakrishna—His life and Sayaings, F. Max Mueller.

২২। Ramakrishna and His Disciples—Christopher Isherwood.

২৩। Paramahansa Sri Ramakrishna—R. R. Diwakar.

২৪। Ramakrishna's Attitude Toward the Absolute and the Finite God—James B. Pratt.

২৫। Ramakrishna and What He Stands For—Count Herman Keyserling.

২৬। A Luminous Soul of India—Frederick B. Robinson.

২৭। Tantras—A General Study, Manoranjan Basu, Calcutta.